পরিচয়

হে পাঠক! প্রাচীন পরিব্রাজক আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া দ্বারে দন্ডায়মান। তোমরাও কুলগত আতিথ্য চিরপ্রথিত। অতিথি যতিকে পূর্বের ন্যায় সম্মানপূর্বক আহ্বান করিয়া গৃহমধ্যে স্থান দিবে কি? এবার কেবল ভারতভ্রমণ নহে, পৃথিবীর নানাস্থানে পর্যটনের অভিজ্ঞতা-দানে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে সে-সকল কথা শুনিলে বুঝিবে, তাঁহার ভ্রমণ উদ্দেশ্যবিহীন নহে। কিসে ভারতে বর্তমান অমানিশার অবসান হইয়া পূর্বগৌরব পুনরায় উজ্জ্বলতর বর্ণে উদ্ভাসিত হইবে -- এই চিন্তা ও চেষ্টাই তাঁহার প্রতি পাদবিক্ষেপের মূলে। আবার ভারতের দুর্দশা কোথা হইতে আসিল, কোন্ শক্তিবলে উহা অপগত হইবে, কোথায়ই বা সে সুপ্তশক্তি নিহিত রহিয়াছে এবং উহার উদ্বোধন ও প্রয়োগের উপকরণই বা কি -- এ-সকল গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিয়াই যে তাঁহাকে ক্ষান্ত দেখিবে, তাহা নহে; কিন্তু বদ্ধপরিকর যতি স্বদেশে-বিদেশে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া মীমাংসিত বিষয়সকলের সত্যতাও যথাসম্ভব প্রমাণিত করিয়াছেন, তাহার নিদর্শনও প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিমান বিদেশী তাঁহার উপদেশ কার্যে পরিণত করিয়া বলপুষ্ট হইতে চলিল; হে স্বদেশী! তুমিও কি এইবার তোমারই জন্য বহুশ্রমে সমাহৃত সারগর্ভ সত্যগুলি হৃদয়ে ধারণ এবং কার্যে পরিণত করিয়া সফলকাম হইবে? ইতি --

বিনীত

সারদানন্দ

১ মাঘ, ১৩১২

পরিব্রাজক

[১৮৯৯ খ্রীঃ ২০ জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতা হইতে গোলকোন্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামীজী নিয়মিতভাবে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠাইতে সম্মত হন। পত্রাকারে লিখিত সেই নানা অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ভ্রমণকাহিনীকেই উদ্বোধনের ১ম ও ২য় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাতযাত্রীর পত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পরে স্বামী সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে 'পরিব্রাজক' রূপে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

এই লেখায় 'তু-ভায়া' স্বামী তুরীয়ানন্দকে বুঝাইতেছে। 'স্বামীজি' বলিয়া এখানে পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বোধন করিতেছেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে।

ভূমিকা

স্বামীজি! ওঁ নমো নারায়ণায় -- 'মো'কারটা হৃষীকেশী ঢঙের উদাত্ত করে নিও ভায়া। আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলেছে, রোজই তোমায় কি হচ্চে না হচ্চে, খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা পত্র কাগজ কলমও যথেষ্ট দিয়েছ, কিন্তু -- ঐ বাঙালী 'কিন্তু' বড়ই গোল বাধায়। একের নম্বর -- কুড়েমি। ডায়েরি, না কি তোমরা বলো, রোজ লিখবো মনে করি, তার পর নানা কাজে সেটা অনন্ত 'কাল' নামক সময়েতেই থাকে; এক পা-ও এগুতে পারে না। দুয়ের নম্বর -- তারিখ প্রভৃতি মনেই থাকে না। সেগুলো সব তোমরা নিজগুণে পূর্ণ করে নিও। আর যদি বিশেষ দয়া কর তো, মনে করো যে, মহাবীরের মতো বার তিথি মাস মনে থাকতেই পারে না -- রাম হৃদয় বলে। কিন্তু বাস্তবিক কথাটা হচ্ছে এই যে, সেটা বুদ্ধির দোষ এবং ঐ কুড়েমি। কি উৎপাত! 'ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ' -- থুড়ি, হল না 'ক্ব সূর্যপ্রভববংশচূড়ামণিরামৈকশরণো বানরেন্দ্র' আর কোথা আমি দীন -- অতি দীন। তবে তিনিও শত যোজন সমুদ্র পার এক লাফে হয়েছিলেন, আর আমরা কাঠের বাড়ীর মধ্যে বন্ধ হয়ে, ওছল পাছল করে, খোঁটাখুঁটি ধরে চলৎশক্তি বজায় রেখে, সমুদ্র পার হচ্চি। একটা বাহাদুরি আছে -- তিনি লঙ্কায় পৌঁছে রাক্ষস-রাক্ষুসীর চাঁদমুখ দেখেছিলেন, আর আমরা রাক্ষস-রাক্ষুসীর দলের সঙ্গে যাচ্চি! খাবার সময় সে শত ছোরার চকচকানি আর শত কাঁটার ঠকঠকানি দেখে শুনে তু-ভায়ার তো আক্কেল গুড়ুম। ভায়া থেকে থেকে সিঁটকে ওঠেন, পাছে পার্শ্ববর্তী রাঙাচুলো বিড়ালাক্ষ ভুলক্রমে ঘ্যাঁচ করে ছুরিখানা তাঁরই গায়ে বা বসায় -- ভায়া একটু নধরও আছেন কিনা। বলি হ্যাঁগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সী-সিক্‌নেস্[১] হয়েছিল কিনা, সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ো-পন্ডিত মানুষ, বাল্মীকি-আল্মীকি কত জান; আমাদের 'গোসাঁইজী' তো কিছুই বলছেন না। বোধ হয় -- হয়নি; তবে ঐ যে, কার মুখে প্রবেশ করেছিলেন, সেইখানটায় একটু সন্দেহ হয়। তু-ভায়া বলছেন, জাহাজের গোড়াটা যখন হুস্ করে স্বর্গের দিকে উঠে ইন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করে, আবার তৎক্ষণাৎ ভুস্ করে পাতালমুখো হয়ে বলি রাজাকে বেঁধবার চেষ্টা করে, সেই সময়টা তাঁরও বোধ হয় যেন কার মহা বিকট বিস্তৃত মুখের মধ্যে প্রবেশ করছেন। মাফ ফরমাইয়ো ভাই -- বালা লোককে কাজের ভার দিয়েছ। রাম কহো! কোথায় তোমার সাতদিন সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা দেবো, তাতে কত রঙ চঙ মসলা বার্নিশ থাকবে, কত কাব্যরস ইত্যাদি, আর কিনা আবল-তাবল বকছি! ফলকথা, মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে, এখন খপ করে স্বভাবের সৌন্দর্যবোধ কোথা পাই বলো। 'কাঁহা কাশী, কাঁহা কাশ্মীর, কাঁহা খোরাশান গুজরাত'[২], আজন্ম ঘুরছি। কত পাহাড় নদ, নদী, গিরি, নির্ঝর, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিরনীহারমন্ডিত মেঘমেখলিত পর্বতশিখর, উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গকল্লোলশালী কত বারিনিধি দেখলুম, শুনলুম, ডিঙুলুম, পার হলুম। কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রামঘড়ঘড়ায়িত ধূলিধূসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে -- কিংবা

[১] Sea-sickness -- জাহাজের দুলুনিতে মাথাঘোরা এবং বমনাদি হওয়া।

[২] তুলসীদাসের দোঁহার মধ্যে এই বাক্যটি আছে।

পানের পিক-বিচিত্রিত দ্যালে, টিকটিকি-ইঁদুর-ছুঁচো-মুখরিত একতলা ঘরের মধ্যে দিনের বেলায় প্রদীপ জ্বেলে -- আঁব-কাঠের তক্তায় বসে, থেলো হুঁকো টানতে টানতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে -- হুবহু ছবিগুলি -- চিত্রিত করে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ করাই আমাদের দুরাশা। শ্যামাচরণ ছেলেবেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, যেথায় আকণ্ঠ আহার করে একঘটি জল খেলেই বস্ -- সব হজম, আবার খিদে, সেখানে শ্যামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল প্রাকৃতিক বিরাট ও সুন্দর ভাব উপলব্ধি করেছে। তবে একটু গোল যে, ঐ পশ্চিম -- বর্ধমান পর্যন্ত নাকট শুনতে পাই।

তবে একান্তই তোমাদের উপরোধ, আর আমিও যে একেবারে 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস' নহি, সেটা প্রমাণ করবার জন্য শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আরম্ভ করি; তোমরাও খোঁটাখুঁটি ছেড়ে দিয়ে শোনো:

নদীমুখ বা বন্দর হতে জাহাজ রাত্রে প্রায় ছাড়ে না -- বিশেষ কলকাতার ন্যায় বাণিজ্যবহুল বন্দর, আর গঙ্গার ন্যায় নদী। যতক্ষণ না জাহাজ সমুদ্রে পৌঁছায়, ততক্ষণই আড়কাটীর[৩] অধিকার; তিনিই কাপ্তেন, তাঁরই হুকুম; সমুদ্রে বা আসবার সময় নদীমুখ হতে বন্দরে পৌঁছে দিয়ে তিনি খালাস। আমাদের গঙ্গার মুখে দুটি প্রধান ভয়: একটি বজবজের কাছে জেমস্ ও মেরী নামক চোরা বালি, দ্বিতীয়টি ডায়মন্ড হারবারের মুখে চড়া। পুরো জোয়ারে, দিনের বেলায় পাইলট অতি সন্তর্পণে জাহাজ চালান, নতুবা নয়। কাজেই গঙ্গা থেকে বেরুতে আমাদের দুদিন লাগলো।

গঙ্গার শোভা ও বাঙলার রূপ

হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল -- যার মধ্যে দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদু হিমশীতল 'গাঙ্গ্যং বারি মনোহরি' আর সেই অদ্ভুত 'হর হর হর' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরিনির্ঝরের 'হর হর' প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখন্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জল পান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎসকুলের নির্ভয় বিচরণ? সে গঙ্গাজল-প্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ, সে হিমালয়বাহিনী গঙ্গা, শ্রীনগর, টিহিরি, উত্তরকাশী, গঙ্গোত্রী, তোমাদের কেউ কেউ গোমুখী পর্যন্ত দেখেছ; কিন্তু আমাদের কর্দমাবিলা, হরগাত্রবিঘর্ষণশুভ্রা, সহস্রপোতবক্ষা এ কলকাতার গঙ্গায় কি এক টান আছে তা ভোলবার নয়। সে কি স্বদেশপ্রিয়তা বা বাল্যসংস্কার কে জানে? হিন্দুর সঙ্গে মায়ের সঙ্গে একি সম্বন্ধ! -- কুসংস্কার কি? -- হবে! গঙ্গা গঙ্গা করে জন্ম কাটায়, গঙ্গাজলে মরে, দূর দূরান্তরে লোক গঙ্গাজল নিয়ে যায়, তাম্রপত্রে যত্ন করে রাখে, কত অর্থব্যয় করে গঙ্গোত্রীর জল রামেশ্বরের উপর নিয়ে গিয়ে চড়ায়; হিন্দু বিদেশে যায় -- রেঙ্গুন, জাভা, হংকং, জাঞ্জীবর, মাডাগাস্কর, সুয়েজ, এডেন, মালটা -- সঙ্গে গঙ্গাজল, সঙ্গে গীতা। গীতা গঙ্গা -- হিঁদুর হিঁদুয়ানি। গেল বারে আমিও একটু নিয়ে গিয়েছিলুম -- কি জানি। বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান করলেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটি কোটি মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদসঞ্চারের মধ্যে যেন স্থির হয়ে যেত! সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বিসংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, লন্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম -- সব লোপ হয়ে যেত, আর শুনতাম -- সেই 'হর হর হর', দেখতাম -- সেই হিমালয়ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিণী যেন হৃদয়ে মস্তকে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন -- 'হর হর হর!!'

এবার তোমরাও পাঠিয়েছ দেখছি মাকে মান্দ্রাজের জন্য। কিন্তু একটা কি অদ্ভুত পাত্রের মধ্যে মাকে প্রবেশ

[৩] আড়কাটী -- যিনি বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলের গভীরতাদি জানেন এবং বন্দরের নিকটে জাহাজ চালাইবার ভার লন, সভরষঢ়.

করিয়েছ ভায়া। তু-ভায়া বালব্রহ্মচারী 'জ্বলন্নিব ব্রহ্মায়েন তেজসা'; ছিলেন 'নমো ব্রহ্মণে,' হয়েছেন 'নমো নারায়ণায়' (বাপ, রক্ষা আছে!), তাই বুঝি ভায়ার হস্তে ব্রহ্মার কমন্ডলু ছেড়ে মায়ের বদ্‌নায় প্রবেশ। যা হোক, খানিক রাত্রে উঠে দেখি, মায়ের সেই বৃহৎ বদ্‌নাকার কমন্ডলুর মধ্যে অবস্থানটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সেটা ভেদ করে মা বেরুবার চেষ্টা করছেন। ভাবলুম সর্বনাশ, এইখানেই যদি হিমাচল-ভেদ, ঐরাবত-ভাসান, জহ্নুর কুটির ভাঙা প্রভৃতি পর্বাভিনয় হয় তো -- গেছি। স্তব স্তুতি অনেক করলুম, মাকে অনেক বুঝিয়ে বললুম -- মা! একটু থাক, কাল মান্দ্রাজে নেমে যা করবার হয় করো, সে দেশে হস্তী অপেক্ষাও সূক্ষ্মবুদ্ধি অনেক আছেন, সকলেরই প্রয় জহ্নুর কুটির, আর ঐ যে চকচকে কামানো টিকিওয়ালা মাথাগুলি, ওগুলি সব প্রায় শিলাখন্ডে তৈয়ারি, হিমাচল তো ওর কাছে মাখম, যত পার ভেঙো, এখন একটু অপেক্ষা কর। উঁহু; মা কি শোনে! তখন এক বুদ্ধি ঠাওরালুম, বললুম -- মা দেখ, ঐ যে পাগড়ি মাথায় জামাগায়ে চাকরগুলি জাহাজে এদিক ওদিক করছে, ওরা হচ্চে নেড়ে -- আসল গরুখেকো নেড়ে, আর ঐ যারা ঘরদোর সাফ করে ফিরছে, ওরা হচ্চে আসল মেথর, লালবেগের[৪] যদি কথা না শোনো তো ওদের ডেকে তোমায় ছুঁইয়ে দিইছি আর কি! তাতেও যদি না শান্ত হো, তোমায় এক্ষুণি বাপের বাড়ী পাঠাব; ঐ যে ঘরটি দেখছ, ওর মধ্যে বন্ধ করে দিলেই তুমি বাপের বাড়ীর দশা পাবে, আর তোমার ডাক হাঁক সব যাবে, জমে একখানি পাথর হয়ে থাকতে হবে। তখন বেটী শান্ত হয়। বলি, শুধু দেবতা কেন, মানুষেরও ঐ দশা -- ভক্ত পেলেই ঘাড়ে চড়ে বসেন।

কি বর্ণনা করতে কি বকছি আবার দেখ! আগেই তো বলে রেখেছি, আমার পক্ষে ওসব একরকম অসম্ভব, তবে যদি সহ্য কর তো আবার চেষ্টা করতে পারি।

আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাইবোন ছেলেমেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশষ্পশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলা দেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ -- কিছু আছে মলয়ালমে (মালাবার), আর কিছু কাশ্মীরে। জলে কি আর রূপ নাই? জলে জলময় মুষলধারে বৃষ্টি কচুর পাতার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্চে, রাশি রাশি তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা একটু অবনত হয়ে সে ধারাসম্পাত বইছে, চারিদিকে ভেকের ঘর্ঘর আওয়াজ -- এতে কি রূপ নাই? আর আমাদের গঙ্গার কিনার -- বিদেশ থেকে না এলে, ডায়মন্ড হারবারের মুখ দিয়ে না গঙ্গায় প্রবেশ করলে সে বোঝা যায় না। সে নীল-নীল আকাশ, তার কোলে কালো মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল-নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মতো হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ পীতাভ, একটু কালো মেশানো -- ইত্যাদি হরেক রকম সবুজের কাঁড়ি ঢালা আঁব-নিচু-জাম-কাঁটাল -- পাতাই পাতা -- গাছ ডালপালা আর দেখা যাচ্চে না, আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলছে, দুলছে, আর সকলের নীচে -- যার কাছে ইয়ারকান্দি ইরানী তুর্কিস্তানি গালচে-দুলচে কোথাও হার মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদূর চাও -- সেই শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস; গঙ্গার মৃদুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে অবধি ঘাসে আঁটা। আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আবার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা! একটি রঙে এন রকমারি, আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছ কখন কি -- যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ, বলি -- এই বেলা এ গঙ্গা-মা'র শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে এ সব যাবে।

---

[৪] ঐতিহাসিক ইলিয়টের মতে লালবেগীদের (ঝাড়ুদার মেথর সম্প্রদায়বিশেষ) উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ ও উত্তরপশ্চিমের লালগুরু (রাক্ষস অরণ্য কিরাত) অভিন্ন। বারাণসীবাসী লালবেগীদের মতে পীর জহরই (চিন্তিয়া সাধু সৈয়দ সাহ্ জুহুর) লালবেগ।

ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন -- ইটের পাঁজা, আর নাববেন এট-খোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি ঘাসের সঙ্গে খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্ল্যাট, আর সেই গাধাবোট; আর ঐ তাল-তমাল-আঁব-নিচুর রঙ, ঐ নীল আকাশ, মেঘের বাহার -- ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে -- পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মতো অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি!!!

বঙ্গোপসাগরে

এইবার জাহাজ সমুদ্রে পড়ল। ঐ যে 'দূরাদয়শ্চক্র' ফক্র 'তমালতালী-বনরাজি' ইত্যাদি[৫] ওসব কিছু কাজের কথা নয়। মহাকবিকে নমস্কার করি, কিন্তু তিনি বাপের জন্মে হিমালয়ও দেখেননি, সমুদ্রও দেখেননি, এই আমার ধারণা।[৬]

এইখানে ধলায় কালোয় মেশামেশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন সর্বত্র দুর্লভ হলেও 'গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।' তবে এ জায়গা বলে ঠিক গঙ্গার মুখ নয়। যা হোক আমি নমস্কার করি, 'সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং' বলে।

কি সুন্দর! সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলজল তরঙ্গায়িত, ফেনিল, বায়ুর সঙ্গে তালে তালে নাচ্চে। পেছনে আমাদের গঙ্গাজল, সেই বিভূতিভূষণা, সেই 'গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেঃ'[৭] সে জল অপেক্ষাকৃত স্থির। সামনে মধ্যবর্তী রেখা। জাহাজ একবার সাদা জলের, একবার কালো জলের উপর উঠছে। ঐ সাদা জল শেষ হয়ে গেল। এবার খালি নীলাম্বু, সামনে পেছনে আশে পাশে খালি নীল নীল নীল জল, খালি তরঙ্গভঙ্গ। নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ-আভা, নীল পট্টবাস পরিধান। কোটি কোটি অসুর দেবভয়ে সমুদ্রের তলায় লুকিয়েছিল; আজ তাদের সুযোগ, আজ তাদের বরুণ সহায়, পবনদেব সাথী; মহা গর্জন, বিকট হুঙ্কার, ফেনময় অট্টহাস, দৈত্যকুল আজ মহোদধির উপর রণতান্ডবে বত্ত হয়েছে! তার মাযে আমাদের অর্ণবপোত; পোতমধ্যে যে জাতি সসাগরা-ধরাপতি, সেই জাতির নরনারী -- বিচিত্র বেশভূষা, স্নিগ্ধ চন্দ্রের ন্যায় বর্ণ, মূর্তিমান আত্মনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়, কৃষ্ণবর্ণের নিকট দর্প ও দম্ভের ছবির ন্যায় প্রতীয়মান -- সগর্ব পাদচারণ করিতেছে। উপরে বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমূতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির তরঙ্গকুলের লম্ফ-ঝম্ফ গুরুগজ্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল-উপেক্ষাকারী মহাযন্ত্রের হুহুঙ্কার -- সে এক বিরাট সম্মিলন -- তন্দ্রাচ্ছন্নের ন্যায় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি; সহসা এ সমস্ত যেন ভেদ করিয়া বহু স্ত্রীপুরুষকণ্ঠের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর নাদ ও তার-সম্মিলিত 'রুল ব্রিটানিয়া রুল দি ওয়েভস্' মহাগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল! চমকিয়া চাহিয়া দেখি --

জাহাজ বেজায় দুলছে, আর তু-ভায়া দুহাত দিয়ে মাথাটি ধরে অন্নপ্রাশনের অন্নের পুনরাবিষ্কারের চেষ্টায় আছেন।

---

[৫] দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।। -- রঘুবংশ।

[৬] কাশ্মীর ভ্রমণ এবং ঐ দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া পরে স্বামীজীর এই বিষয়ে মত পরিবর্তিত হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস অনেক দিন পর্যন্ত কাশ্মীর দেশের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন -- এ কথা ঐ দেশের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। রঘুবংশাদি-বিবৃত হিমালয়-বর্ণনা কাশ্মীরখন্ডের হিমালয়ের দৃশ্যের সহিত অনেক স্থলে মিলে। কিন্তু কালিদাস কখন সমুদ্র দেখিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই।

[৭] শ্রীমৎশঙ্করাচার্যকৃত 'শিবাপরাধভঞ্জনস্তোত্র'।

সেকেন্ড ক্লাসে দুটি বাঙালী ছেলে -- পড়তে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা ভায়ার চেয়ো খারাপ। একটি তো এমনি ভয় পেয়েছে, বোধ হয় তীরে নামতে পারলে একছুটে চোঁচা দেশের দিকে দৌড়য়। যাত্রীদের মধ্যে তারা দুটি আর আমরা দুজন ভারতবাসী -- আধুনিক ভারতের প্রতিনিধি। যে দুদিন জাহাজ গঙ্গার মধ্যে ছিল, তু-ভায়া 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের গুপ্ত উপদেশের ফলে 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধ শীঘ্র শীঘ্র শেষ করবার জন্য দিক করে তুলতেন। আজ আমিও সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ভায়া, বর্তমান ভারতের অবস্থা কিরূপ?' ভায়া একবার সেকেন্ড ক্লাসের দিকে চেয়ে, একবার নিজের দিকে চেটে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে জবাব দিলেন, 'বড়ই শোচনীয় -- বেজায় গুলিয়ে যাচ্চে!'

এত বড় পদ্মা ছেড়ে গঙ্গার মাহাত্ম হুগলি নামক ধারায় কেন বর্তমান, তার কারণ অনেকে বলেন যে, ভাগীরথী-মুখই গঙ্গার প্রধান এবং আদি জলধারা। পরে গঙ্গা পদ্মা-মুখ করে বেরিয়ে গেছেন। ঐ প্রকার 'টলিজ নালা' নামক খাল ও আদিগঙ্গা হয়ে গঙ্গার প্রাচীন স্রোত ছিল। কবিকঙ্কণ পোতবণিক-নায়ককে ঐ পথেই সিংহল দ্বীপে নিয়ে গেছেন। পূর্বে ত্রিবেণী পর্যন্ত বড় বড় জাহাজ অনায়াসে প্রবেশ করত। সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীন বন্দর এই ত্রিবেণী ঘাটের কিঞ্চিৎ দূরেই সরস্বতীর উপর ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই সপ্তগ্রাম বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। ক্রমে সরস্বতীর মুখ বন্ধ হতে লাগলো। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ ঐ মুখ এত বুজে এসেছে যে, পোর্তুগিজেরা আপনাদের জাহাজ আসবার জন্যে কতকদূর নীচে গিয়ে গঙ্গার উপর স্থান নিল। উহাই পরে বিখ্যাত হুগলি-নগর। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই স্বদেশী বিদেশী সওদাগরেরা গঙ্গায় চড়া পড়বার ভয়ে ব্যাকুল; কিন্তু হলে কি হবে; মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি আজও বড় একটা কিছু করে উঠতে পারেনি। মা গঙ্গা ক্রমশই বুজে আসছেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী পাদ্রী লিখছেন, সূতির কাছে ভাগীরথী-মুখ সে সময়ে বুজে গিয়েছিল। অন্ধকুপের হলওয়েল -- মুর্শিদাবাদ যাবার রাস্তায় শান্তিপুরে জল ছিল না বলে ছোট নৌকা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কোলব্রুক সাহেব লিখছেন যে, গ্রীষ্মকালে ভাগীরথী আর জলাঙ্গী[৮] নদীতে নৌকা চলে না। ১৮২২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত গরমিকালে ভাগীরথীতে নৌকার গমাগম বন্ধ ছিল। ইহার মধ্যে ২৪ বৎসর দুই বা তিন ফিট জল ছিল। ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা হুগলির এক মাইল নীচে চুঁচড়ায় বাণিজ্যস্থান করলে; ফরাসীরা আরও পরে এসে তার আরও নীচে চন্দননগরের পাঁচ মাইল নীচে অপর পারে বাঁকীপুর নামক জায়গায় আড়ত খুললে। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনে মারেরা চন্দননগর হতে আট মাইল দচরে শ্রীরামপুরে আড়ত করলে। তার পর ইংরেজরা কলকেতা বসালেন আরও নীচে। পূর্বোক্ত সমস্ত জায়গায়ই আর জাহাজ যেতে পারে না। কলকেতা এখনও খোলা, তবে 'পরেই বা কি হয়' এই ভাবনা সকলের।

তবে শান্তিপুরের কাছাকাছি পর্যন্ত গঙ্গায় যে গরমিকালেও এত জল থাকে, তার এক বিচিত্র কারণ আছে। উপরের ধারা বন্ধপ্রায় হলেও রাশীকৃত জল মাটির মধ্য দিয়ে চুইয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। গঙ্গার খাদ এখনও পাড়ের জমি হতে অনেক নীচু। যদি ঐ খাদ ক্রমে মাটি বসে উঁচু হয়ে উঠে, তাহলেই মুশকিল। আর এক ভয়ের কিংবদন্তী আছে; কলকেতার কাছেও মা গঙ্গা ভূমিকম্প বা অন্য কারণে মধ্যে মধ্যে এমন শুকিয়ে গেছেন যে, মানুষে হেঁটে পার হয়েছে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে নাকি ঐরকম হয়েছিল। আর এক রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার দুপুরবেলায় ভাঁটার সময় গঙ্গা একদম শুকিয়ে গেলেন। ঠিক বারবেলায় এইটে ঘটলে কে হত, তোমরাই বিচার কর -- গঙ্গা বোধ হয় আর ফিরতেন না।

এই তো গেল উপরের কথা। নীচে মহাভয় -- 'জেমস্ আর মেরী' চড়া। পূর্বে দামোদর নদ কলকেতার ৩০ মাইল উপরে গঙ্গায় এসে পড়ত, এখন কালের চিত্রগতিতে তিনি ৩১ মাইলের উপর দক্ষিণে এসে হাজির। তার প্রায়

[৮] জলাঙ্গী নদী নবদ্বীপ হইতে কিছু দূরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমের পর হইতেই ভাগীরথীর নাম হুগলি হইয়াছে।

ছ মাইল নীচে রূপনারায়ণ জল ঢালছেন, মণিকাঞ্চনযোগে তাঁরা তো হুড়মুড়িয়ে আসুন, কিন্তু এ কাদা ধোয় কে? কাজেই রাশীকৃত বালি। সে স্তূপ কখন এখানে, কখন ওখানে, কখন একটু শক্ত, কখন বা নরম হচ্চেন। সে ভয়ের সীমা কি! দিনরাত তার মাপজোখ হচ্ছে, একটু অন্যমনস্ক হলেই -- দিনকতক মাপজোখ ভুললেই, জাহাজের সর্বনাশ। সে চড়ায় ছুঁতে না ছুঁতেই অমনি উলটে ফেলা, না হয় সোজাসুজিই গ্রাস!! এমনও হয়েছে, মস্ত তিন-মাস্তুল জাহাজ লাগবার আধ ঘন্টা বাদেই খালি একটু মাস্তুলমাত্র জেগে রইলেন। এ চড়া দামোদর-রূপনারায়ণের মুখই বটেন। দামোদর এখন সাঁতোলি গাঁয়ে তত রাজি নন, জাহাজ-স্টীমার প্রভৃতি চাটনি রকমে নিচ্চেন। ১৮৭৭ কলকেতা থেকে 'কাউন্টি অফ স্টারলিং' নামক এক জাহাজে ১৪৪৪ টন গম বোঝাই নিয়ে যাচ্ছিল। ঐ বিকট চড়ায় যেমন লাগা আর তার আট মিনিটের মধ্যেই 'খোঁজ খবর নাহি পাই'। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৮০০ টন বোঝাই একটি স্টীমারের দশ-মিনিটের মধ্যে ঐ দশা হয়। ধন্য মা তোমার মুখ! আমরা যে ভালয় ভালয় পেরিয়ে এসেছি, প্রণাম করি।

তু-ভায়া বললেন, 'মশায়! পাঁটা মানা উচিত মাকে'; আমিও বলি, 'তথাস্তু, একদিন কেন ভায়া, প্রত্যহ।' পরদিন তু-ভায়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'মশায়, তার কি হল?' সেদিন আর জবাব দিলুম না। তার পরদিন আবার জিজ্ঞাসা করতেই খাবার সময় তু-ভায়াকে দেখিয়ে দিলুম, পাঁটা মানার দৌড়টা কতদূর চলছে। ভায়া কিছু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ও তো আপনি খাচ্চেন।' তখন অনেক যত্ন করে বোঝাতে হল যে -- কোন গঙ্গাহীন দেশে নাকি কলকেতার এক ছেলে শ্বশুরবাড়ী যায়; সেখানে খাবার সময় চারিদিকে ঢাকঢোল হাজির; আর শাশুড়ীর বেজায় যেদ, 'আগে একটু দুধ খাও।' জামাই ঠাওরালে বুঝি দেশাচার, দুধের বাটিতে যেই চুমুকটি দেওয়া -- অমনি চারিদিকে ঢাকঢোল বেজে ওঠা। তখন তার শাশুড়ী আনন্দাশ্রুপরিপ্লুতা হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আর্শীবাদ করে বললে, 'বাবা! তুমি আজ পুত্রের কাজ করলে, এই তোমার পেটে গঙ্গাজল আছে, আর দুধের মধ্যে ছিল তোমার শ্বশুরের অস্থি গুঁড়া করা, -- শ্বশুর গঙ্গা পেলেন।' অতএব হে ভাই! আমি কলকেতার মানুষ এবং জাহাজে পাঁটার ছড়াছড়ি, ক্রমাগত মা গঙ্গায় পাঁটা চড়ছে, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। ভায়া যে গম্ভীরপ্রকৃতি, বক্তৃতাটা কোথায় দাঁড়াল -- বোঝা গেল না।

জাহাজের কথা

এ জাহাজ কি আশ্চর্য ব্যাপার! যে সমুদ্র -- ডাঙা থেকে চাইলে ভয় হয়, যাঁর মাঝখানে আকাশটা নুয়ে এসে মিলে গেছে বোধ হয়, যাঁর গর্ভ হতে সূর্যমামা ধীরে ধীরে উঠেন আবার ডুবে জান, যাঁর একটু ভ্রূভঙ্গে প্রাণ থরহরি, তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাজপথ, সকলের চেয়ে সস্তা পথ! এ জাহাজ করলে কে? কেউ করেনি; অর্থাৎ মানুষের প্রধান সহায়স্বরূপ যে সকল কলকব্জা আছে, যা নইলে একদন্ড চলে না, যার ওলটপালটে আর সব কলকারখানার সৃষ্টি, তাদের ন্যায় -- সকলে মিলে করেছে। যেমন চাকা; চাকা নইলে কি কোন কাজ চলে? হ্যাঁকচ হোঁকচ গরুর গাড়ী থেকে 'জয় জগন্নাথে'র রথ পর্যন্ত, সুতো-কাটা চরকা থেকে প্রকান্ড প্রকান্ড কারখানার কল পর্যন্ত কিছু চলে? এ চাকা প্রথম করলে কে? কেউ করেনি, অর্থাৎ সকলে মিলে করেছে। প্রাথমিক মানুষ কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, বড় বড় গুঁড়ি ঢালু জায়গায় গড়িয়ে আনছে, ক্রমে তাকে কেটে নিরেট চাকা তৈরি হল ক্রমে অরা নাভি ইত্যাদি ইত্যাদি -- আমাদের চাকা। কত লাখ বৎসর লেগেছিল কে জানে? তবে এ ভারতবর্ষে যা হয়, তা থেকে যায়। তার যত উন্নতি হোক না কেন, যত পরিবর্তন হোক না কেন, নীচের ধাপগুলিতে ওঠবার লোক কোথা না কোথা থেকে এসে জোটে, আর সব ধাপগুলি রয়ে যায়। একটা বাঁশের গায়ে একটা তার বেঁধে বাজনা হল; তার ক্রমে একটা বালাঞ্চির ছড়ি দিয়ে প্রথম বেহালা হল, ক্রমে কত রূপ বদল হল, কত তার হল, তাঁত হল, থড়ির নাম রূপ বদলালো, এসরাজ সারঙ্গি হলেন। কিন্তু এখনও কি গাড়োয়ান মিঞারা ঘোড়ার গাছকতক বালাঞ্চি নিয়ে একটা ভাঁড়ের মধ্যে বাঁশের

চোঙ বসিয়ে ক্যাঁকো করে 'মজোয়ার কাহারের' জাল বুনবার বৃত্তান্ত[৯] জাহির করে না? মধ্যপ্রদেশে দেখগে, এখনও নিরেট চাকা গড়গড়িয়ে যাচ্ছে! তবে সেটা নিরেট বুদ্ধির পরিচয় বটে, বিশেষ এ রবার-টায়ারের দিনে।

অনেক পুরাণকালের মানুষ, অর্থাৎ সত্যযুগের যখন আপামর সাধারণ এমনি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন যে, পাছে ভেতরে একখান ও বাহিরে আর একখান হয় বলে কাপড় পর্যন্ত পরতেন না। পাছে স্বার্থপরতা আসে বলে বিবাহ করতেন না; এবং ভেদ-বুদ্ধিরহিত হয়ে কোঁৎকা লোড়া-লুড়ির সহায়ে সবর্দাই 'পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ' বোধ করতেন; তখন জলে বিচরণ করবার জন্য তাঁরা গাছের মাঝখানটা পুড়িয়ে ফেলে অথবা দু-চারখানা গুঁড়ি একত্রে বেঁধে সালতি ভেলা ইত্যাদির সৃষ্টি করেন। উড়িষ্যা হতে কলম্বো পর্যন্ত (Catamaran) দেখেছ তো? ভেলা কেমন সমুদ্রেও দূর দূর পর্যন্ত চলে যায় দেখেছ তো? উনিই হলেন -- 'ঊর্ধ্বমূলম্'।

আর ঐ যে বাঙ্গাল মাঝির নৌকা -- যাতে চড়ে দরিয়ার পাঁচ পীরকে ডাকতে হয়; ঐ যে চাটগেঁয়ে-মাঝি-অধিষ্ঠিত বজরা -- যা একটু হাওয়া উঠলেই হালে পানি পায় না এবং যাত্রীদের আপন আপন 'দ্যাব্তার' নাম নিতে বলে; ঐ যে পশ্চিমে ভড় -- যার গায়ে নানা চিত্রবিচিত্র-আঁকা পেতলের চোক দেওয়া, দাঁড়ীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড় টানে, ঐ যে শ্রীমন্ত সদাগরের নৌকা (কবিকঙ্কণের মতে শ্রীমন্ত দাঁড়ের জোরেই বঙ্গোপসাগর পার হয়েছিলেন এবং গলদা চিঙড়ির গোঁপের মধ্যে পড়ে, কিস্তি বানচাল হয়ে ডুবে যাবার যোগাড় হয়েছিলেন; তথাপি কড়ি দেখে পুঁটিমাছ ঠাউরেছিলেন ইত্যাদি) ওরফে গঙ্গাসাগুরে ডিঙি -- উপরে সুন্দর ছাওয়া, নীচে বাঁশের পাটাতন, ভেতরে সারি সারি গঙ্গাজলের জালা (যাতে 'মেতুয়া গঙ্গাসাগর' -- থুড়ি, তোমরা গঙ্গাসাগর যাও আর কনকনে উত্তরে হাওয়ার গুঁতোয় 'ডাব নারিকেল চিনির পানা' খাও না); ঐ যে পানসি নৌকা, বাবুদের আপিস নিয়ে যায় আর বাড়ী আনে, বালির মাঝি যার নায়ক, বড় মজবুত, ভারি ওস্তাদ -- কোন্নগুরে মেঘ দেখেছে কি কিস্তি সামলাচ্চে, এক্ষণে জা জোয়ানপুরিয়া জোয়ানের দখলে চলে যাচ্চে (যাদের বুলি -- 'আইলা গাইলা বানে বানি', যাদের ওপর তোমাদের মহন্ত মহারাজের 'বঘাসুর' ধরে আনতে হুকুম হয়েছিল, যারা ভেবেই আকুল -- 'এ স্বামিনাথ! এ বঘাসুর কঁহা মিলেব? ইত হাম জানব না')। ঐ যে গাধাবোট -- যিনি সোজাসুজি যেতে জানেনই না, ঐ যে হুড়ি, এক থেকে তিন মাস্তুল -- লঙ্কা, মালদ্বীপ বা আরব থেকে নারকেল, খেজুর, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি বোঝাই হয়ে আসে; আর কত বলব, ওঁরা সব হলেন -- 'অধঃশাখা প্রশাখা'।

পালভরে জাহাজ চালানো একটি আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়া। হাওয়া যে দিকে যাক না কেন, জাহাজ আপনার গম্যস্থানে গম্যস্থানে পৌঁছবেই পৌঁছবে। তবে হাওয়া বিপক্ষ হলে একটু দেরি। পালওয়ালা জাহাজ কেমন দেখতে সুন্দর, দূরে বোধ হয়, যেন বহুপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরাজ আকাশ থেকে নামছেন। পালের জাহাজ কিন্তু সোজা চলতে বড় পারেন না; হাওয়া একটু বিপক্ষ হলেই এঁকে বেঁকে চলতে হয়, তবে হাওয়া একেবারে বন্ধ হলেই মুশকিল -- পাখা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়। মহা-বিষুবরেখার নিকটবর্তী দেশ সমূহে এখনও মাঝে মাঝে এইরূপ হয়। এখন পাল-জাহাজেও কাঠ-কাঠরা কম, তিনিও লৌহনির্মিত। পাল-জাহাজের কাপ্তানি করা বা মাল্লাগিরি করা স্টীমার অপেক্ষা অনেক শক্ত, এবং পাল-জাহাজে অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কাপ্তান কখনও হয় না। প্রতি পদে হাওয়া চেনা, অনেক দূর থেকে সঙ্কট জায়গার জন্য হুঁশিয়ার হওয়া, স্টীমার অপেক্ষা এ দুটি জিনিস পাল-জাহাজে অত্যাবশ্যক। স্টীমার অনেকটা হাতের মধ্যে, কল মুহূর্ত-মধ্যে বন্ধ করা যায়। সামনে পেছনে আশে পাশে যেমন ইচ্ছা অল্প সময়ের মধ্যে ফিরানো যায়। পাল-জাহাজ হাওয়ার হাতে। পাল খুলতে, বন্ধ করতে, হাল ফেরাতে হয়তো জাহাজের সহিত ধাক্কা

---

[৯] মজোয়ার কাহারওয়া জাল বিনুরে।
দিন্‌কো মারে মছলি, রাতকো বিনু জাল।
এয়সা দিকদারি কিয়া জিউকা জঞ্জাল।।
-- ইত্যাদি গানটি গাড়োয়ানরা তখন প্রায়ই গাহিত।

লাগতে পারে। এখন আর যাত্রী বড় পাল-জাহাজে যায় না, কুলী ছাড়া। পাল-জাহাজ প্রায় মাল নিয়ে যায়, তাও নুন প্রভৃতি খেলো মাল। ছোট ছোট পাল-জাহাজ, যেমন হুড়ি প্রভৃতি, কিনারায় বাণিজ্য করে। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে টানবার জন্য স্টীমার ভাড়া করে হাজার হাজার টাকা টেকস্ দিয়ে পাল-জাহাজের পোষায় না। পাল-জাহাজ আফ্রিকা ঘুরে ছ-মাসে ইংলন্ডে যায়। পাল-জাহাজের এই সকল বাধার জন্য তখনকার জল-যুদ্ধ সঙ্কটের ছিল। একটু হাওয়ার এদিক ওদিক, একটু সমুদ্র-স্রোতের এদিক ওদিকে হার জিত হয়ে যেত। আবার সে-সকল জাহাজ কাঠের ছিল। যুদ্ধের সময় ক্রমাগত আগুন লাগত, আর সে আগুন নিবুতে হত। সে জাহাজের গঠনও আর এক রকমের ছিল। একদিক ছিল চেপটা আর অনেক উঁচু, পাঁচ-তলা ছ-তলা। যেদিকটা চেপটা, তারই উপর তলায় এনটা কাঠের বারান্দা বার করা থাকত। তারই সামনে কমান্ডের ঘর -- বৈঠক। আশে পাশে অফিসারদের। তার পর একটা মস্ত ছাত -- উপর খোলা। ছাতের ওপাশে আবার দু-চারটি ঘর। নীচের তলায়ও ঐ রকম ঢাকা দালান, তার নীচেও দালান; তার নীচে দালান এবং মাল্লাদের শোবার স্থান, খাবার স্থান ইত্যাদি। প্রত্যেক তলার দালানের দু-পাশে তোপ বসানো, সারি সারি দ্যালের গায়ে কাটা, তার মধ্য দিয়ে তোপের মুখ -- দু--পাশে রাশীকৃত গোলা (আর যুদ্ধের সময় বারুদের থলে)। তখনকার যুদ্ধ-জাহাজের প্রত্যেক তলাই বড় নীচু ছিল; মাথা হেঁট করে চলতে হত। তখন নৌ-যোদ্ধা যোগাড় করতেও অনেক কষ্ট পেতে হত। সরকারের হুকুম ছিল যে, যেখান থেকে পার ধরে, বেঁধে, ভুলিয়ে লোক নিয়ে যাও। মায়ের কাছ থেকে ছেলে, স্ত্রীর কাছ থেকে স্বামী -- জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেত। একবার জাহাজে তুলতে পারলে হয়, তারপর -- বেচারা কখন হয়তো জাহাজে চড়েনি -- একেবারে হুকুম হল, মাস্তুলে ওঠ। ভয় পেয়ে হুকুম না শুনলেই চাবুক। কতক মরেও যেত। আইন করলেন আমীরেরা, দেশ-দেশান্তরের বাণিজ্য লুটপাট করবার জন্য; রাজস্ব ভোগ করবেন তাঁরা, আর গরীবদের খালি রক্তপাত, শরীরপাত, যা চিরকাল এ পৃথিবীতে হয়ে আসছে!! এখন ও-সব আইন নেই, এখন আর 'প্রেস গ্যাঙ্গের' নামে চাষা-ভূষোর হৃৎকম্প হয় না। এখন খুশির সোদা; তবে অনেকগুলি চোর-ছ্যাঁচড় ছোঁড়াকে জেলে না দিয়ে এই যুদ্ধ-জাহাজে নাবিকের কর্ম শেখানো হয়।

বাষ্পবল এ সমস্তই বদলে ফেলেছে। এখন 'পাল' -- জাহাজে অনাবশ্যক বাহার। হাওয়ার সহায়তার উপর নির্ভর বড়ই অল্প। ঝড়-ঝাপটার ভয়ও অনেক কম। কেবল জাহাজ না পাহাড়-পর্বতে ধাক্কা খায়, এই বাঁচাতে হয়। যুদ্ধ-জাহাজে তো একেবারে পূর্বের অবস্থার সঙ্গে বিলকুল পৃথক্। দেখে তো জাহাজ বলে মনেই হয় না। এক একটি ছোট বড় ভাসন্ত কেল্লা। তোপও সংখ্যায় অনেক কমে গেছে। তবে এখনকার কলের তোপের কাছে সে প্রাচীন তোপ ছেলেখেলা বই তো নয়। আর এ যুদ্ধ-জাহাজের বেগই বা কি! সব চেয়ে ছোটগুলি 'টরপিডো' ছুঁড়বার জন্য, তার চেয়ে একটু বড়গুলি শত্রুর বাণিজ্যপোত দখল করতে, আর বড়-বড়গুলি হচ্চেন বিরাট যুদ্ধের আয়োজন।

আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্সের সিভিল ওয়ারের সময়, ঐকরাজ্যপক্ষেরা[১০] একখান কাঠের জঙ্গি জাহাজের গায় কতকগুলো লোহার রেল সারি সারি বেঁধে ছেয়ে দিয়েছিল। বিপক্ষের গোলা তার গায়ে লেগে, ফিরে যেতে লাগলো, জাহাজের কিছুই বড় করতে পারলে না। তখন মতলব করে, জাহাজের গা লোহা দিয়ে জোড়া হতে লাগলো, যাতে দুশমনের গোলা কাষ্ঠভেদ না করে। এদিকে জাহাজি তোপেরও তালিম বাড়তে চলল -- তা-বড় তা-বড় তোপ; তোপ -- যাতে আর হাতে সরাতে, হটাতে, ঠাসতে, ছুঁড়তে হয় না, সব কলে হয়। পাঁচ-শ লোক যাকে একটুকুও হেলাতে পারে না, এমন তোপ, এখন একটা ছোট ছেলে কল টিপে যে দিকে ইচ্ছে মুখ ফেরাচ্চে, নাবাচ্চে ও ঠাসছে, ভরছে, আওয়াজ করছে -- আবার তাও চকিতের ন্যায়! যেমন জাহাজের লোহার দ্যাল মোটা হতে লাগলো, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্রভেদী তোপেরও সৃষ্টি হতে চলল। এখন জাহাজখানি ইস্পাতের দ্যালোয়ালা কেল্লা, আর তোপগুলি যমের ছোট ভাই। এক গোলার ঘায়ে, যত বড় জাহাজই হন না, ফেটে চুটে চৌ-চাকলা! তবে এই 'লুয়ার বাসর ঘর', যা নকিন্দরের বাবা স্বপ্নেও ভাবেননি; এবং যা 'সাতালি পর্বতের' ওপর না দাঁড়িয়ে সত্তর হাজার

[১০] Unionist Party.

পাহাড়ে ঢেউয়ের মাথায় নেচে নেচে বেড়ায়, ইনিও 'টরপিডো'র ভয়ে অস্থির। তিনি হচ্চেন কতকটা চুরুটের চেহারা একটি নল; তাঁকে তাগ করে ছেড়ে দিলে তিনি জলের মধ্যে মাছের মতো ডুবে ডুবে চলে যান। তারপর যেখানে লাগবার, সেখানে ধাক্কা যেই লাগা, আমনি তার মধ্যের রাশিকৃত মহাবিস্তারশীল পদার্থসকলের বিকট আওয়াজ ও বিস্ফোরণ, সঙ্গে সঙ্গে যে জাহাজের নীচে এই কীর্তিটা হয়, তার 'পুনর্মূষিকো ভব' অর্থাৎ লৌহত্বে ও কাটকুটোত্বে কতক এবং বাকীটা ধূমত্বে ও অগ্নিত্বে পরিণমন! মনিষ্যিগুলো, যারা এই টরপিডো ফাটবার মুখে পড়ে যায়, তাদেরও যা খুঁজে পাওয়া যায়, তা প্রায় 'কিমা'তে পরিণত অবস্থায়! এই সকল জঙ্গি জাহাজ তৈয়ার হওয়া অবধি জলযুদ্ধ আর বেশী হতে হয় না। দু-একটা লড়াই আর একটা বড় জঙ্গি ফতে বা একদম হার। তবে এই রকম জাহাজ নিয়ে লড়াই হবার পূর্বে, লোকে যেমন ভাবত যে, দু-পক্ষের কেউ বাঁচবে না, আর একদম সবে উড়ে পুড়ে যাবে, তত কিছু হয় না।

ময়দানি জঙ্গের সময়, তোপ বন্দুক থেকে উভয় পক্ষের উপর যে মুষলধারা গোলাগুলি সম্পাত হয়, তার এক হিস্‌সে যদি লক্ষ্যে লাগে তো উভয় পক্ষের ফৌজ মরে দু-মিনিটে ধুন হয়ে যায়। সেই প্রকার, দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের গোলা, যদি ৫০০ আওয়াজের একটা লাগত তো উভয় পক্ষের জাহাজের নাম-নিশানাও থাকত না। আশ্চর্য এই যে, যত তোপ-বন্দুক উৎকর্ষ লাভ করছে, বন্দুকের যত ওজন হালকা হচ্চে, যত নালের কিরকিরার পরিপাটি হচ্চে, যত পাল্লা বেড়ে যাচ্চে, যত ভরবার ঠাসবার কলকব্জা হচ্চে, যত তাড়াতাড়ি আওয়াজ হচ্চে, ততই যেন গুলি ব্যর্থ হচ্চে! পুরানো ঢঙের পাঁচ হাত লম্বা তোড়াদার জজেল, যাকে দোঠেঙ্গো কাঠের উপর রেখে, তাগ করতে হয়, এবং ফুঁ ফাঁ দিয়ে আগুন দিতে হয়, তাই-সহায় বারাখজাই, আফ্রিদ আদমী অব্যর্থ-সন্ধান -- আর আধুনিক সুশিক্ষিত ফৌজ, নানা-কল-কারখানা-বিশিষ্ট বন্দুক হাতে, মিনিটে ১৫০ আওয়াজ করে খালি হাওয়া গরম করে। অল্প স্বল্প কলকব্জা ভাল। মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিন্ড তৈয়ার করে। কারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর, সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে -- এক এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়ই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে -- আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ -- খেতেই পায় না। জড়ের মতো একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়। স্কুলমাস্টারি, কেরানিগিরি করে ঐ জন্যই হস্তিমূর্খ জড়পিন্ড তৈয়ার হয়!

বাণিজ্য-যাত্রী জাহাজের গড়ন অন্য ঢঙের। যদিও কোন কোন বাণিজ্য-জাহাজ এমন ঢঙের তৈয়ার যে, লড়ায়ের সময় অত্যল্প আয়াসেই দু-চারটা তোপ বসিয়ে অন্যান্য নিরস্ত্র পণ্যপোতকে তাড়াহুড়ো দিতে পারে এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন সরকার হতে সাহায্য পায়, তথাপি সাধারণতঃ সমস্তগুলিই যুদ্ধপোত হতে অনেক তফাৎ। এ সকল জাহাজ প্রায়ই এখন বাষ্পপোত এবং প্রায় এত বৃহৎ ও এত দাম লাগে যে, কোম্পানি ভিন্ন একলার জাহাজ নাই বললেই হয়। আমাদের দেশের ও ইওরোপের বাণিজ্যে পিন. এন্ড ও. কোম্পানি সকলের অপেক্ষা প্রাচীন ও ধনী; তারপর, বি. আই. এস্. এন্. কোম্পানি; আরও অনেক কোম্পানি আছে। ভিন্ন সরকারের মধ্যে মেসাজারি মারিতীম (Messageries Maritimes) ফরাসী, অস্ট্রিয়ান লয়েড, জার্মান লয়েড এবং ইতালিয়ান রুবাটিনো কোম্পানি প্রসিদ্ধ। এতন্মধ্যে পি. এন্ড ও. কোম্পানি যাত্রী-জাহাজ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও ক্ষিপ্রগামী -- লোকের এই ধারণা। মেসাজারির ভক্ষ্য-ভোজ্যের বড়ই পারিপাট্য।

এবার আমারা যখন আসি, তখন ঐ দুই কোম্পানিই প্লেগের ভয়ে কালা আদমী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আমাদের সরকারের একটা আইন আছে যে, যেন কোন কালা আদমী এমিগ্রান্ট অফিসের সার্টিফিকেট ভিন্ন বাহিরে না যায়। অর্থাৎ আমি যে স্ব-ইচ্ছায় বিদেশে যাচ্চি, কেউ আমায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোথাও বেচবার জন্য বা কুলী করবার জন্য নিয়ে যাচ্চে না, এইটি তিনি লিখে দিলে তবে জাহাজে আমায় নিলে। এই আইন এতদিন ভদ্রলোকের বিদেশ যাওয়ার পক্ষে নীরব ছিল, এক্ষণে প্লেগের ভয়ে জেগে উঠেছে; অর্থাৎ যে কেউ 'নেটিভ' বাহিরে

যাচ্চে, তা যেন সরকার টের পান। তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত, আমুক ছোট জাত; সরকারের কাছে সব 'নেটিভ'। মহারাজা, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র -- সব এক জাত -- 'নেটিভ'। কুলীর আইন, কুলীর যে পরীক্ষা, তা সকল 'নেটিভের' জন্য -- ধন্য ইংরেজ সরকার! একক্ষণের জন্যও তোমার কৃপায় সব 'নেটিভের' সঙ্গে সমত্ব বোধ করলেম। বিশেষ, কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায় আমি তো চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

এখন সকল জাতির মুখে শুনেছি, তাঁরা নাকি পাকা আর্য! তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে -- কেউ চার পো আর্য, কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কাঁচ্চা! তবে সকলেই আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য! আর শুনি, ওঁরা আর ইংরেজরা নাকি এক জাত, মাসতুতো ভাই; ওঁরা কালা আদমী নন। এ দেশে দয়া করে এসেছেন, ইংরেজের মতো। আর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মূর্তিপূজা, সতীদাহ, জেনানা পরদা ইত্যাদি ইত্যাদি -- ও-সব ওঁদের ধর্মে আদৌ নাই। ও-সব ঐ কায়েতফায়েতের বাপ-দাদা করেছে। আর ওঁদের ধর্মটা ঠিক ইংরেজদের ধর্মের মতো। ওঁদের বাপ-দাদা ঠিক ইংরেজদের মতো ছিল; কেবল রোদ্দুরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে কালো হয়ে গেল! এখন এস না এগিয়ে? 'সব নেটিভ' সরকার বলছেন। ও কালোর মধ্যে আবার এক পোঁচ কম-বেশী বোঝা যায় না; সরকার বলছেন, সব নেটিভ। সেজেগুজে বসে থাকলে কি হবে বলো? ও টুপি-টাপা মাথায় দিয়ে আর কি হবে বলো? যত দোষ হিঁদুর ঘাড়ে ফেলে সাহেবের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে গেলে, লাথি-ঝাঁটার চোটটা বেশী বই কম পড়বে না। ধন্য ইংরেজরাজ! তোমার ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ তো হয়েছেই, আরও হোক, আরও হোক। কপনি, ধুতির টুকরো পরে বাঁচি। তোমার কৃপায় শুধু-পায়ে শুধু-মাথায় হিল্লী দিল্লী যাই, তোমার দয়ায় হাত চুবড়ে সপাসপ দাল-ভাত খাই। দিশি সাহেবিত্ব লুভিয়েছিল আর কি, ভোগা দিয়েছিল আর কি। দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি ধর্ম ছাড়লেই, দিশি চালচলন ছাড়লেই ইংরেজ রাজা মাথায় করে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, এমন সময় গোরা পায়ের সবুট লাথির হুড়োহুড়ি, চাবুকের সপাসপ! পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ কবলা। 'সাধ ক'রে শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। ধন্য ইংরেজ সরকার! তোমার 'তখ্‌ৎ তাজ অচল রাজধানী' হউক।

আর যা কিছু সাহেব হবার সাধ ছিল, মিটিয়ে দিলে মার্কিন ঠাকুর। দাড়ির জ্বালায় অস্থির, কিন্তু নাপিতের দোকানে ঢোকবামাত্রই বললে 'ও চেহারা এখানে চলবে না'! মনে করলুম, বুঝি পাগড়ি-মাথায় গেরুয়া রঙের বিচিত্র ধোকড়া-মন্ত্র গায়, অপরূপ দেখে নাপিতের পছন্দ হল না; তা একটা ইংরেজি কোট আর টোপা কিনে আনি। আনি আর কি -- ভাগ্যিস একটি ভদ্র মার্কিনের সঙ্গে দেখা; সে বুঝিয়ে দিলে যে বরং ধোকড়া আছে ভাল, ভদ্রলোকে কিছু বলবে না, কিন্তু ইওরোপী পোশাক পরলেই মুশকিল, সকলেই তাড়া দেবে। আরও দু-একটা নাপিত ঐ প্রকার রাস্তা দেখিয়ে দিলে। তখন নিজের হাতে কামাতে ধরলুম। খিদেয় পেট জ্বলে যায়, খাবার দোকানে গেলুম, 'অমুক জিনিসটা দাও'; বললে 'নেই'। 'ঐ যে রয়েছে।' 'ওহে বাপু সাদা ভাষা হচ্চে, তোমার এখানে বসে খাবার জায়গা নেই।' 'কেন হে বাপু?' 'তোমার সঙ্গে যে খাবে, তার জাত যাবে।' তখন অনেকটা মার্কিন মুলুককে দেশের মতো ভাল লাগতে লাগলো। যাক পাপ কালা আর ধলা, আর এই নেটিভের মধ্যে উনি পাঁচ পো আর্য রক্ত, উনি চার পো, উনি দেড় ছটাক কম, ইনি আধ ছটাক, আধ কাঁচ্চা বেশী ইত্যাদি -- বলে 'ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দ সিকে।' একটা ডোম বলত, 'আমাদের চেয়ে বড় জাত আর দুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্‌ম্‌ম্‌!' কিন্তু মজাটি দেখছ? জাতের বেশী বিটলেমিগুলো -- যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, সেইখানে!

বাষ্পপোত বায়ুপোত অপেক্ষা অনেক বড় হয়। যে সকল বাষ্পপোত আটলান্টিক পারাপার করে, তার এক একখান আমাদের এই 'গোলকোন্ডা'[১১] জাহাজের ঠিক দেড়া। যে জাহাজে করে জাপান হতে পাসিফিক্ পার হওয়া

[১১] বি. আই. এস. এন. কোম্পানির একখানি জাহাজের নাম। ঐ জাহাজে স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন।

গিয়েছিল, তাও ভারি বড় ছিল। খুব বড় জাহাজের মাঝখানে প্রথম শ্রেণী, দুপাশে খানিকটা জায়গা, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণী ও 'স্টীয়ারেজ' এদিক ওদিকে। আর এক সীমায় খালাসীদের ও চাকরদের স্থান। স্টীয়ারেজ যেন তৃতীয় শ্রেণী; তাতে খুব গরীব লোক যায়, যারা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ করতে যাচ্চে। তাদের থাকবার স্থান অতি সামান্য এবং হাতে হাতে আহার দেয়। যে সকল জাহাজ হিন্দুস্থান ও ইংলন্ডের মধ্যে যাতায়াত করে, তাদের স্টীয়ারেজ নাই, তবে ডেকযাত্রী আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে খোলা জায়গা, সেই স্থানটায় তারা বসে শুয়ে যায়। তা দূর-দূরের যাত্রায় তো একটিও দেখলুম না। কেবল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে যাবার সময়, বম্বে থেকে কতকগুলি চীনে লোক বরাবর হংকং পর্যন্ত ডেকে গিয়েছিল।

ঝড়-ঝাপট হলেই ডেকযাত্রীর বড় কষ্ট, আর কতক কষ্ট যখন বন্দরে মাল নাবায়। এক উপরে 'হরিকেন ডেক' ছাড়া সব ডেকের মধ্যে একটা করে চৌকা কাটা আছে, তারই মধ্য দিয়ে মাল নাবায় এবং তোলে। সেই সময় ডেকযাত্রীদের একটু কষ্ট হয়। নতুবা কলকেতা হতে সুয়েজ পর্যন্ত এবং গরমের দিনে ইওরোপেও ডেকে বড় আরাম। যখন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা তাঁদের সাজানো গুজানো কামরার মধ্যে গরমের চোটে তরলমূর্তি ধরবার চেষ্টা করছেন, তখন ডেক যেন স্বর্গ। দ্বিতীয় শ্রেণী -- এসব জাহাজের বড়ই খারাপ। কেবল এক নূতন জার্মান লয়েড কোম্পানি হয়েছে; জার্মানির বের্গেন নামক শহর হতে অস্ট্রেলিয়ায় যায়; তাদের দ্বিতীয় শ্রেণী বড় সুন্দর, এমন কি 'হরিকেন ডেকে' পর্যন্ত ঘর আছে; একটি এ পাশে, একটি ও পাশে। একটিতে থাকেন ডাক্তার, আর একটি আমাদের দিয়েছিল। কিন্তু গরমের ভয়ে আমরা নীচের তলায় পালিয়ে এলুম। ঐ ঘরটি জাহাজের ইঞ্জিনের উপর। জাহাজ লোহার হলেও যাত্রীদের কামরাগুলি কাঠের; ওপর নীচে, সে কাঠের দেয়ালে বায়ুসঞ্চারের জন্য অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। দ্যালগুলিতে 'আইভরি পেন্ট' লাগানো; এক একটি ঘরে তার জন্য প্রায় পঁচিশ পাউন্ড খরচ পড়েছে। ঘরের মধ্যে একখানি ছোট কার্পেট পাতা। একটি দ্যালের গায়ে দুটি খুরোহীন লোহার খাটিয়ার মতো এঁটে দেওয়া; একটির উপর আর একটি। অপর দ্যালেও ঐ রকম একখানি 'সোফা'। দরজার ঠিক উল্টা দিকে মুখ হাত ধোবার জায়গা, তার উপর একখানি আরশি, দুটো বোতল, খাবার জলের দুটো গ্লাস। ফি-বিছানার গায়ের দিকে একটি করে জালতি পেতলের ফ্রেমে লাগানো। ঐ জালতি ফ্রেম সহিত দ্যালের গায়ে লেগে যায়, আবার টানলে নেবে আসে। রাত্রে যাত্রীদের ঘড়ি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র তাইতে রেখে শোয়। নীচের বিছানার নীচে সিন্দুক প্যাটরা রাখবার জায়গা। সেকেন্ড ক্লাসের ভাবও ঐ, তবে স্থান সঙ্কীর্ণ ও জিনিসপত্র খেলো। জাহাজি কারবারটা প্রায় ইংরেজের একচেটে। সেজন্য অন্যান্য জাতেরা যে সকল জাহাজ করেছে, তাতেও ইংরেজযাত্রী অনেক বলে খাওয়া-দাওয়া অনেকটা ইংরেজদের মতো করতে হয়। সময়ও ইংরেজী-রকম করে আনতে হয়। ইংলন্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে, রুশিয়াতে খাওয়া-দাওয়ায় এবং সময়ে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন আমাদের ভারতবর্ষে -- বাঙলায়, হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাতে, মান্দ্রাজে তফাৎ। কিন্তু এ সকল পার্থক্য জাহাজে অল্প দেখা যায়। ইংরেজীভাষী যাত্রীর সংখ্যাধিক্যে ইংরেজী ঢঙে সব গড়ে যাচ্চে।

বাষ্পপোতে সর্বেসর্বা কর্তা হচ্চেন 'কাপ্তেন'। পূর্বে 'হাই সী'তে[১২] কাপ্তেন জাহাজে রাজত্ব করতেন; কাউকে সাজা দিতেন, ডাকাত ধরে ফাঁসি দিতেন, ইত্যাদি। এখন অত নাই, তবে তাঁর হুকুমই আইন -- জাহাজে তাঁর নীচে চারজন 'অফিসার' বা (দিশি নাম) 'মালিম', তারপর চার পাঁচ জন ইঞ্জিনিয়র। তাদের যে 'চীফ্', তার পদ অফিসারের সমান, সে প্রথম শ্রেণীতে খেতে পায়। আর আছে চার পাঁচ জন 'সুকানি' -- যারা হাল ধরে থাকে পালাক্রমে, এরাও ইওরোপী। বাকী সমস্ত চাকর-বাকর, খালাসী, কয়লাওয়ালা হচ্চে দেশী লোক, সকলেই মুসলমান। হিন্দু কেবল বোম্বায়ের তরফে দেখেছিলুম, পি. এন্ড ও. কোম্পানির জাহাজে। চাকররা এবং খালাসিরা কলকেতার, কয়লাওয়ালারা পূর্ববঙ্গের, রাঁধুনীরাও পূর্ববঙ্গের ক্যাথলিক ক্রিশ্চান। আর আছে চার জন মেথর। কামরা হতে ময়লা জল সাফ প্রভৃতি মেথররা করে, স্নানের বন্দোবস্ত করে, আর পায়খানা প্রভৃতি দুরস্ত রাখে। মুসলমান

[১২] সমুদ্রের যেখানে কোন দিকের কূলকিনারা দেখা যায় না, অথবা যেখান হইতে নিকটবর্তী উপকূল দুই-তিন দিনের পথ।

চাকর-খালাসীরা ক্রিশ্চানের রান্না খায় না; তাতে আবার জাহাজে প্রত্যহ শোর তো আছেই। তবে অনেকটা আড়াল দিয়া কাজ সারে। জাহাজের রান্নাঘরের তৈয়ারী রুটি প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে খায়, এবং যে সকল কলকেত্তাই চাকর নয়া রোশনাই পেয়েছে, তারা আড়ালে খাওয়া-দাওয়া বিচার করে না। লোকজনদের তিনটা 'মেস' আছে। একটা চাকরদের, একটা খালাসীদের, একটা কয়লাওয়ালাদের; একজন করে ভান্ডারী অর্থাৎ রাঁধুনী আর একটি চাকর কোম্পানি ফি-মেসকে দেয়। ফি-মেসের একটা রাঁধবার স্থান আছে। কলকাতা থেকে কতক হিঁদু ডেকযাত্রী কলম্বোয় যাচ্ছিল; তারা ঐ ঘরে চাকরদের রান্না হয়ে গেলে রেঁধে খেত। চাকরবাকররা জলও নিজেরা তুলে খায়। ফি-ডেকে দ্যালের গায় দুপাশে দুটি 'পম্প'; একটি নোনা, একটি মিঠে জলের, সেখান হতে মিঠে জল তুলে মুসলমানেরা ব্যবহার করে। যে সকল হিঁদুর কলের জলে আপত্তি নাই, খাওয়া-দাওয়ার সম্পূর্ণ বিচার রক্ষা করে এই সকল জাহাজে বিলাত প্রভৃতি দেশে যাওয়া তাদের অত্যন্ত সোজা। রান্নাঘর পাওয়া যায়, কারুর ছোঁয়া জল খেতে হয় না, স্নানের পর্যন্ত জল অন্য কোন জাতের ছোঁবার আবশ্যক নাই; চাল ডাল শাক পাত মাছ দুধ ঘি সমস্তই জাহাজে পাওয়া খায়, বিশেষ এই সকল জাহাজে দেশী লোক সমস্ত কাজ করে বলে ডাল চাল মুলো কপি আলু প্রভৃতি রোজ রোজ তাদের বার করে দিতে হয়। এক কথা -- 'পয়সা'। পয়সা থাকলে একলাই সম্পূর্ণ আচার রক্ষা করে যাওয়া যায়।

এই সকল বাঙালী লোকজন প্রায় আজকাল সব জাহাজে -- যেগুলি কলকেতা হতে ইওরোপে যায়। এদের ক্রমে একটা জাত সৃষ্টি হচ্চে; কতকগুলি জাহাজী পারিভাষিক শব্দেরও সৃষ্টি হচ্চে; কাপ্তেনকে এরা বলে -- 'বাড়িওয়ালা', অফিসার -- 'মালিম', মাস্তুল -- 'ডোল', পাল -- 'সড়', নামাও -- 'আরিয়া', ওঠাও -- 'হাবিস' (heave) ইত্যাদি।

খালাসীদের এবং কয়লাওয়ালাদের একজন করে সরদার আছে, তার নাম 'সারেঙ্গ', তার নীচে দুই তিন জন 'টিন্ডাল', তারপর খালাসী বা কয়লাওয়ালা।

খানসামাদের (boy) কর্তার নাম 'বট্‌লার' (butler); তার উপর একজন গোরা 'স্টুয়ার্ড'। খালাসীরা জাহাজ ধোয়া-পোঁছা, কাছি ফেলা তোলা, নৌকা নামানো ওঠানো, পাল তোলা, পাল নামানো (যদিও বাষ্পপোতে ইহা কদাপি হয়) ইত্যাদি কাজ করে। সারেঙ্গ ও টিন্ডালরা সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে, এবং কাজ করছে। কয়লা-ওয়ালা ইঞ্জিন-ঘরে আগুন ঠিক রাখছে; তাদের কাজ দিনরাত আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আর তার শাখা-প্রশাখা সাফ রাখা কি সোজা কাজ? 'সারেঙ্গ' এবং তার 'ভাই' আসিস্টান্ট সারেঙ্গ কলকেতার লোক, বাঙলা কয়, অনেকটা ভদ্রলোকের মতো, লিখতে পড়তে পারে স্কুলে পড়েছিল, ইংরেজীও কয় -- কাজ চালানো। সারেঙ্গের তের বছরের ছেলে কাপ্তেনের চাকর -- দরজায় থাকে আরদালী। এই সকল বাঙালী খালাসী, কয়লাওয়ালা, খানসামা প্রভৃতির কাজ দেখে, স্বজাতির উপর যে একটা হতাশ বুদ্ধি আছে, সেটা অনেকটা কমে গেল। এরা কেমন আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে আসছে, কেমন সবলশরীর হয়েছে, কেমন নির্ভীক অথচ শান্ত! সে নেটিভি পা-চাটা মেথরগুলোরও নেই -- কি পরিবর্তন!

দেশী মাল্লারা কাজ করে ভাল, মুখে কথাটি নাই, আবার সিকিখানা গোরার মাইনে। বিলাতে অনেকে অসন্তুষ্ট; বিশেষ -- অনেক গোরার অন্ন যাচ্চে দেখে, খুশী নয়। তারা মাঝে মাঝে হাঙ্গামা তোলে। আর তো কিছু বলবার নেই; কাজে গোরার চেয়ে চটপটে। তবে বলে, ঝট-ঝাপটা হলে, জাহাজ বিপদে পড়লে এদের সাহস থাকে না। হরিবোল হরি! কাজে দেখা যাচ্ছে -- ও অপবাদ মিথ্যা। বিপদের সময় গোরাগুলো ভয়ে মদ খেয়ে, জড় হয়ে নিকম্মা হয়ে যায়। দেশী খালাসী এক ফোঁটা মদ জন্মে খায় না, আর এ পর্যন্ত কোন মহা বিপদে একজনও কাপুরুষত্ব দেখায়নি। বলি, দেশী সেপাই কি কাপুরুষত্ব দেখায়? তবে নেতা চাই। জেনারেল স্ট্রঙ্ নামক এক

ইংরেজ বন্ধু সিপাহী-হাঙ্গামার সময় এদেশে ছিলেন। তিনি 'গদরে'র গল্প অনেক করতেন। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করা গেল যে, সিপাহীদের এত তোপ বারুদ রসদ হাতে ছিল, আবার তারা সুশিক্ষিত ও বহুদর্শী, তবে এমন করে হেরে মলো কেন? জবাব দিলেন যে, তাদের মধ্যে যারা নেতা হয়েছিল, সেগুলো অনেক পেছনে থেকে 'মারো বাহাদুর -- লড়ো বাহাদুর' করে চেঁচাচ্ছিল; অফিসার এগিয়ে মৃত্যুমুখে না গেলে কি সিপাহী লড়ে? সকল কাজেই এই। 'শিরদার তো সরদার'; মাথা দিতে পারো তো নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে নেতা হতে চাই; তাইতে কিছুই হয় না। কেউ মানে না!

ভারত -- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর; আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্চ দশ হাজার বচ্ছরের মমি!! যাদের 'চলমান শ্মশান' বলে তোমাদের পূর্বপুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্চ তোমরা। তোমাদের বাড়ী-ঘর-দুয়ার মিউজিয়ম, তোমাদের আচার-ব্যবহার চালচলন দেখলে বোধ হয়, যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনছি! তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করেও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্রশালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল প্রহেলিকা, আসল মরু-মরীচিকা তোমরা -- ভারতের উচ্চবর্ণেরা! তোমরা ভূত কাল -- লুঙ্ লঙ্ লিট্ সব এক সঙ্গে। বর্তমানকালে তোমাদের দেখছি বলে যে বোধ হচ্চে, ওটা অজীর্ণতাজনিত দুঃস্বপ্ন। ভবিষ্যতের তোমরা শূন্য, তোমরা ইৎ -- লোপ লুপ্। স্বপ্নরাজ্যর লোক তোমরা, আর দেরি করছ কেন? ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংসহীন-কঙ্কালকুল তোমরা, কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্চ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্নপেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরেজ রাজ্যে -- অবাধ বিদ্যাচর্চার দিনে উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে -- তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে -- তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি -- ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হোয়া, অমনি শুনবে কোটি-জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যেকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি -- 'ওয়াহ্ গুরু কি ফতে'।[১৩]

জাহাজ বঙ্গোপসাগরে যাচ্চে। এ সমুদ্র নাকি বড়ই গভীর। যেটুকু অল্প জল ছিল, সেটুকু মা গঙ্গা হিমালয় গুঁড়িয়ে পশ্চিম ধুয়ে এনে, বুজিয়ে জমি করে নিয়েছেন। সে জমি আমাদের বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ আর বড় এগুচ্চেন না, ঐ সোঁদরবন পর্যন্ত। কেউ বলেন, সোঁদরবন পূর্বে গ্রাম-নগরময় ছিল, উচ্চ ছিল। অনেকে এখন ও-কথা মানতে চায় না। যা হোক ঐ সোঁদরবনের মধ্যে আর বঙ্গোপসাগরের উত্তরভাগে অনেক কারখানা হয়ে গেছে। এই

[১৩] গুরুজীর জয়, গুরুই ধন্য হউন, গুরুই জয়যুক্ত হউন। উহা পঞ্জাব প্রদেশের শিখ-সম্প্রদায়ের উৎসাহবাক্য এবং রণসঙ্কেত।

সকল স্থানেই পোর্তুগিজ বম্বেটেদের আড্ডা হয়েছিল; আরাকানরাজের এই সকল স্থান অধিকারের বহু চেষ্টা মোগল-প্রতিনিধির গঞ্জালেজ-প্রমুখ পোর্তুগিজ বম্বেটের শাসিত করবার নানা উদ্যোগ; বারংবার ক্রিশ্চান, মোগল, মগ, বাঙালীর যুদ্ধ।

দক্ষিণী সভ্যতা

একে বঙ্গোপসাগর স্বভাবচঞ্চল, তাতে আবার এই বর্ষাকালে, মৌসুমের সময়, জাহাজ খুব হেলতে দুলতে যাচ্চেন। তবে এইতো আরম্ভ, পরে বা কি আছে! যাচ্চি মান্দ্রাজ। এই দাক্ষিণাত্যের বেশির ভাগই এখন মান্দ্রাজ। জমিতে কি হয়? ভাগ্যবানের হাতে পড়ে মরুভূমিও স্বর্গ হয়। নগন্য ক্ষুদ্র মান্দ্রাজ শহর যার নাম চিন্নাপট্টনম্, অথবা মান্দ্রাসপট্টনম্, চন্দ্রগিরির রাজা একদল বণিককে বেচেছিল। তখন ইংরেজের ব্যবসা জাভায়। বান্তাম শহর ইংরেজদিগের আশিয়ার বাণিজ্যের কেন্দ্র। মান্দ্রাজ প্রভৃতি ইংরেজী কোম্পানির ভারতবর্ষের সব বাণিজ্যস্থান বান্তামের দ্বারা পরিচালিত। সে বান্তাম কোথায়? আর সে মান্দ্রাজ কি হয়ে দাঁড়াল! শুধু 'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ' নয় হে ভায়া; পেছনে মায়ের বল। তবে উদ্যোগী পুরুষকেই মা বল দেন -- এ-কথাও মানি। মান্দ্রাজ মনে পড়লে খাঁটি দক্ষিণদেশ মনে পড়ে। যদিও কলকেতার জগন্নাথের ঘাটেই দক্ষিণদেশের আমেজ পাওয়া যায় (সেই থর-কামানো মাথা, ঝুটি বাঁধা, কপালে অনেক চিত্র বিচিত্র, শুঁড়-ওলটানো চটিজুতো, যাতে কেবল পায়ের আঙুল-কটি ঢোকে, আর নস্যদরবিগলিত নাসা, ছেলেপুলের সর্বাঙ্গে চন্দনের ছাপা লাগাতে মজবুত) উড়ে বামুন দেখে। গুজরাতি বামুন, কালো কুচকুচে দেশস্থ বামুন, ধপধপে ফরসা বেরালচোখো চৌকা-মাথা কোকনস্থ বামুন, সব ঐ এক প্রকার বেশ, সব দক্ষিণী বলে পরিচিত -- অনেক দেখেছি, কিন্তু ঠিক দক্ষিণী ঢঙ মান্দ্রাজীতে। সে রামানুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললিটমন্ডল -- দূর থেকে যেন ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুন মাখিয়ে পোড়া কাঠের ডগায় বসিয়েছে, যে তিলকের শাগরেদ রামানন্দী তিলকের মহিমা সম্বন্ধে লোকে বলে, 'তিলক তিলক সব কোই কহে, পর রামানন্দী তিলক দিখত গঙ্গা-পারসে যম গৌদ্বারকে খিড়ক্!' (আমাদের দেশে চৈতন্যসম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গে চাপ দোয়া গোসাঁ দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল -- এ মান্দ্রাজী তিলক দেখে চিতেবাঘ গাছে চড়ে!); আর সে তামিল তেলেগু মলয়ালম্ বুলি -- যা ছয় বৎসর শুনেও এক বর্ণ বোঝবার জো নাই, যাতে দুনিয়ার রকমারি ল-কার ও ড-কারের কারখানা; আর সেই 'মুড়গ্তন্নির রসম্'[১৪] সহিত ভাত সাপরানো -- যার এক এক গরাসে বুক ধড়ফড় করে উঠে (এমনি ঝাল আর তেঁতুল!); সে 'মিঠে-নিমের পাতা, ছোলার দাল, মুগের দাল, ফোড়ন, দধ্যোদন' ইত্যাদি ভোজন; আর সে রেড়ির তেল মেখে স্নান, রেড়ির তেলে মাছ ভাজা -- এ না হলে কি দক্ষিণ মুলুক হয়?

আবার এই দক্ষিণ মুলুক, মুসলমান রাজত্বের সময় এবং তার কত দিনের আগে থেকেও হিন্দুধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দক্ষিণ মুলুকেই -- সামনে টিকি, নারকেল-তেলখেকো জাতে -- শঙ্করাচার্যের জন্ম; এই দেশেই রামানুজ জন্মেছিলেন; এই মধ্বমুনির জন্মভূমি। এঁদেরই পায়ের নিচে বর্তমান হিন্দুধর্ম। তোমাদের চৈতন্য-সম্প্রদায় এ মধ্বসমপ্রদায়ের শাখামাত্র; ঐ শঙ্করের প্রতিধ্বনি কবীর, দাদু, নানক, রামসনেহী প্রভৃতি সকলেই; ঐ রামানুজের শিষ্যসম্প্রদায় অযোধ্যা প্রভৃতি দখল করে বসে আছে। এই দক্ষিণদেশেই -- যখন উত্তরভারতবাসী 'আল্লা হু আক্বর, দীন্ দীন্' শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ন ঠাকুর-দেবতা স্ত্রী-পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, [তখন] রাজচক্রবর্তী বিদ্যানগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দক্ষিণদেশেই সেই অদ্ভুত সায়ণের জন্ম্ -- যাঁর

[১৪] অতিরিক্ত ঝাল-তেঁতুল-সংযুক্ত অড়হর দালের ঝোল বিশেষ। উহা দক্ষিণীদের প্রিয় খাদ্য। 'মুড়গ্' অর্থে কাল মরিচ ও 'তন্নি' অর্থে দাল।

যবনবিজয়ী বাহুবলে বুক্করাজের সিংহাসন, মন্ত্রণায় বিদ্যানগর সাম্রাজ্য, নয়মার্গে[১৫] দাক্ষিণাত্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, যাঁর অমানব প্রতিভা ও অলৌকিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ সমগ্র বেদরাশির টীকা, যাঁর আশ্চর্য ত্যাগ বৈরাগ্য ও গবেষণার ফলস্বরূপ 'পঞ্চদশী' গ্রন্থ -- সেই সন্ন্যাসী বিদ্যারণ্যমুনি সায়ণের[১৬] এই জন্মভূমি। মান্দ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের 'সুমের' নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস' তীরে প্রকান্ড সভ্যতা-বিস্তার -- অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি আসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণসংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মালাবার উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আর্যেরা অনেক বিষয়ে ঋণী। এদেরই প্রকান্ড প্রকান্ড মন্দির দাক্ষিণাত্যে বীরশৈব বা বীরবৈষ্ণবসম্প্রদায়ের জয় ঘোষণা করছে। এই যে এত বড় বৈষ্ণবধর্ম -- এ-ও এই 'তামিল' নীচবংশোদ্ভূত শঠকোপ হতে উৎপন্ন, যিনি 'বিক্রীয় সূর্পং স চচার যোগী'। এই তামিল আলোয়াড় বা ভক্তগণ এখনও সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পূজ্য হয়ে রয়েছেন। এখনও এদেশে বেদান্তের দ্বৈত, বিশিষ্ট বা অদ্বৈত -- সমস্ত মতের যেমন চর্চা, তেমন আর কুত্রাপি নাই। এখনও ধর্মের অনুরাগ এদেশে যত প্রবল, তেমন আর কোথাও নাই।

চব্বিশে জুন রাত্রে আমাদের জাহাজ মান্দ্রাজে পৌঁছাল। প্রাতঃকালে উঠে দেখি, সমুদ্রের মধ্যে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে-নেওয়া মান্দ্রাজের বন্দরে রয়েছি। ভেতরে স্থির জল; আর বাইরে উত্তাল তরঙ্গ গজরাচ্চে, আর এক একবার বন্দরের দ্যালে লেগে দশ বার হাত লাফিয়ে উঠছে, আট ফেনময় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সামনে সুপরিচিত মান্দ্রাজের স্ট্রান্ড রোড। দুজন ইংরেজ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, একজন মান্দ্রাজি জমাদার, এক ডজন পাহারাওয়ালা জাহাজে উঠল। অতি ভদ্রতাসহকারে আমায় জানালে যে, কালা আদমীর কিনারায় যাবার হুকুম নাই, গোরার আছে। কালা যেই হোক না কেন, সে যেরকম নোংরা থাকে, তাতে প্লেগবীজ নিয়ে বেড়াবার বড়ই সম্ভাবনা, তবে আমার জন্য মান্দ্রাজীরা বিশেষ হুকুম পাবার দরখাস্ত করেছে, বোধ হয় পাবে। ক্রমে দু-চারটি করে মান্দ্রাজী বন্ধুরা নৌকায় করে জাহাজের কাছে আসতে লাগলো। ছোঁয়াছুঁয়ি হবার জো নাই, জাহাজ থেকে কথা কও। আলাসিঙ্গা, বিলিগিরি, নরসিংহচার্য, ডাক্তার নঞ্জুন্ডরাও, কিডি প্রভৃতি সকল বন্ধুদেরই দেখতে পেলুম। আঁব, কলা, নারিকেল, রাঁধা দধ্যোদন, রাশীকৃত গজা, নিমকি ইত্যাদির বোঝা আসতে লাগলো। ক্রমে ভিড় হতে লাগলো -- ছেলে, মেয়ে, বুড়ো -- নৌকায় নৌকা। আমার বিলাতী বন্ধু মিঃ শ্যামিএর, ব্যারিস্টর হয়ে মান্দ্রাজে এসেছেন, তাঁকেও দেখতে পেলেম। রামকৃষ্ণানন্দ আর নিভৃয়[১৭] বারকতক আনাগোনা করলে। তারা সারাদিন সেই রৌদ্রে নৌকায় থাকবে -- শেষে ধমকাতে তবে যায়। ক্রমে যত খবর হল যে আমাকে নাবতে হুকুম দেবে না, তত নৌকায় ভিড় আরও বাড়তে লাগলো। শরীরও ক্রমাগত জাহাজের বারান্ডায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবসন্ন হয়ে আসতে লাগলো। তখন মান্দ্রাজী বন্ধুদের কাছে বিদায় চাইলাম, কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। আলাসিঙ্গা 'ব্রহ্মবাদিন' ও মান্দ্রাজী কাজকর্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করবার অবসর পায় না; কাজেই সে কলম্বো পর্যন্ত জাহাজে চলল। সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়লে। তখন একটা রোল উঠল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, হাজার খানেক মান্দ্রাজী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা বন্দরের বাঁধের উপর বসেছিল -- জাহাজ ছাড়তেই, তাদের এই বিদায়-সূচক রব! মান্দ্রাজীরা আনন্দ হলে বঙ্গদেশের মতো হুলু দেয়।

মান্দ্রাজ হতে কলম্বো চার দিন। যে তরঙ্গভঙ্গ গঙ্গাসাগর থেকে আরম্ভ হয়েছিল, তা ক্রমে বাড়তে লাগলো। মান্দ্রাজের পর আরও বেড়ে গেল। জাহাজ বেজায় দুলতে লাগলো। যাত্রীরা মাথা ধরে ন্যাকার করে অস্থির। বাঙালীর ছেলে দুটিও ভারি 'সিক্'। একটি তো ঠাউরেছে মরে যাবে; তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওয়া গেল যে কিছু ভয় নেই, অমন সকলেরই হয়, ওতে কেউ মরেও না, কিছুই না। সেকেন্ড কেলাসটা আবার 'স্ক্রুর' ঠিক উপরে। ছেলে-

---

[১৫] নয়মার্গ -- নীতিমার্গ।

[১৬] কাহারও কাহারও মতে বেদভাষ্যকার সায়ণ বিদারণ্যমুনির ভ্রাতা।

[১৭] স্বামীজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী নির্ভয়ানন্দ।

দুটিকে কালা আদমী বলে, একটা অন্ধকূপের মতো ঘর ছিল, তারই মধ্যে পুরেছে। সেখানে পবনদেবেরও যাবার হুকুম নাই, সূর্যেরও পরবেশ নিষেধ। ছেলে-দুটির ঘরের মধ্যে যাবার জো নাই; আর ছাতের উপর -- সে কি দোল। আবার যখন জাহাজের সামনেটা একটা ঢেউয়ের গহ্বরে বসে যাচ্চে, আর পেছনটা উঁচু হয়ে উঠছে, তখন স্ক্রুটা জল ছাড়া হয়ে শূন্যে ঘুরছে, আর সমস্ত জাহাজটা ঢক ঢক ঢক ঢক করে নড়ে উঠছে। সেকেন্ড কেলাসটা ঐ সময় যেমন বেড়ালে ইঁদুর ধরে এক একবার ঝাড়া দেয় তেমনি করে নড়ছে।

যাই হোক এখন মনসুনের সময়। যত -- ভারত মহাসাগরে -- জাহাজ পশ্চিমে চলবে, ততই বাড়বে এই ঝড়ঝাপট। মান্দ্রাজীরা অনেক ফলপাকড় দিয়েছিল; তার অধিকাংশ, আর গজা দধ্যোদন প্রভৃতি সমস্তই ছেলেদের দেওয়া গেল। আলাসিঙ্গা তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনে শুধু-পায়ে জাহাজে চড়ে বসল। আলাসিঙ্গা বলে, সে কখন কখন জুতো পায়ে দেয়। দেশে দেশে রকমারি চাল। ইওরোপে মেয়েদের পা দেখানো বড় লজ্জা; কিন্তু আধখানা গা আদুড় রাখতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মাথাটা ঢাকতে হবেই হবে, তা পরনে কাপড় থাক বা না থাক। আলাসিঙ্গা পেরুমল, এডিটার 'ব্রহ্মবাদিন্' মাইসোরী রামানুজী 'রসম্'-খেকো ব্রাহ্মণ, কামানো মাথায় সমস্ত কপাল জুড়ে, 'তেংকলে' তিলক, 'সঙ্গের সম্বল গোপনে অতি যতনে' এনেছেন কি দুটো পুঁটলি! একটায় চিঁড়ে ভাজা, আর একটায় মুড়ি-মটর। জাত বাঁচিয়ে, ঐ মুড়ি-মটর চিবিয়ে, সিলোনে যেতে হবে! আলাসিঙ্গা আর একবার সিলোনে গিয়েছিল। তাতে বেরাদারিলোক একটু গোল করবার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠেনি। ভারতবর্ষে ঐটুকুই বাঁচোয়া। বেরাদারি যদি কিছু না বলল তো আর কারও কিছু বলবার অধিকার নেই। আর সে দক্ষিণী বেরাদারি -- কোনটায় আছেন সবশুদ্ধ পাঁচ-শ, কোনটায় সাত-শ, কোনটায় হাজারটি প্রাণী -- কনের অভাবে ভাগনীকে বে করে! যখন মাইসোরে প্রথম রেল হয়, যে যে ব্রাহ্মণ দূর থেকে রেলগাড়ি দেখতে গিছল, তারা জাতচ্যুত হয়! যাই হোক, এই আলাসিঙ্গার মতো মানুষ পৃথিবীতে অতি অল্প; অমন নিঃস্বার্থ, অমন প্রাণপণ খাটুনি, অমন গুরু-ভক্ত আজ্ঞাধীন শিষ্য জগতে অল্প হে ভায়া! মাথা কামানো, ঝুটি-বাঁধা, শুধু-পায়, ধুতি-পরা মান্দ্রাজী ফার্স্টক্লাসে উঠল; বেড়াচ্চে-চেড়াচ্চে, খিদে পেলে মুড়ি-মটর চিবুচ্চে। চাকররা মান্দ্রাজীমাত্রকেই ঠাওরায় 'চেট্টি', আর [বলে] 'ওদের অনেক টাকা আছে, কিন্তু কাপড়ও পরবে না, আর খাবেও না'! তবে আমাদের সঙ্গে পড়ে ওর জাতের দফা ঘোলা হচ্চে -- চাকররা বলছে। বাস্তবিক কথা -- তোমাদের পাল্লায় পড়ে মান্দ্রাজীদের জাতের দফা অনেকটা ঘোলা কেন, থক্‌থকিয়ে এসেছে!

সিংহল ও বৌদ্ধধর্ম

আলাসিঙ্গার 'সী-সিকনেস্' হল না; তু-ভায়া প্রথমে একটু আধটু গোল করে সামলে বসে আছেন। চারদিন -- কাজেই নানা বার্তালাপে 'ইষ্টগোষ্ঠী'তে কাটলো। সামনে কলম্বো। এই সিংহল, লঙ্কা। শ্রীরামচন্দ্র সেতু বেঁধে পার হয়ে লঙ্কার রাবণ-রাজাকে জয় করেছিলেন। সেতু তো দেখেচি -- সেতুপতি মহারাজার বাড়িতে, যে পাথরখানির উপর ভগবান রামচন্দ্র তাঁর পূর্বপুরুষকে প্রথম সেতুপতি-রাজা করেন, তাও দেখেচি। কিন্তু এ পাপ বৌদ্ধ সিলোনি লোকগুলো তো মানতে চায় না! বলে -- আমাদের দেশে ও কিংবদন্তী পর্যন্ত নাই। আর নাই বললে কি হবে? -- 'গোসাঁইজী পুঁথিতে লিখেছেন যে।' তার উপর ওরা নিজের দেশকে বলে সিংহল। লঙ্কা বলবে না, বলবে কোত্থেকে? ওদের না কথায় ঝাল, না কাজে ঝাল, না প্রকৃতিতে ঝাল!! রাম বলো -- ঘাগরা-পরা, খোঁপা-বাঁধা, আবার খোঁপায় মস্ত একখানা চিরুনি দেওয়া মেয়েমান্‌সী চেহারা! আবার -- রোগগ-রোগা, বেঁটে-বেঁটে, নরম-নরম শরীর! এরা রাবণ-কুম্ভকর্ণের বাচ্চা? গেছি আর কি! বলে -- বাঙলা দেশ থেকে এসেছিল -- তা ভালই করেছিল। ঐ যে একদল দেশে উঠেছে, মেয়েমানুষের মতো বেশভূষা, নরম-নরম বুলি কাটেন, এঁকে-বেঁকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ রেখে কথা কইতে পারেন না, আর ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের কবিতা লেখেন, আর বিরহের জ্বালায় 'হাঁসেন-

হোঁসেন' করেন -- ওরা কেন যাক না বাপু সিলোনে। পোড়া গবর্নমেন্ট কি ঘুমুচ্চে গা? সেদিন পুরীতে কাদের ধরাপাকড়া করতে গিয়ে হুলুস্থুল বাধালে; বলি রাজধানীতে পাকড়া করে প্যাক করবারও যে অনেক রয়েছে।

একটা ছিল মহা দুষ্টু বাঙালী রাজার ছেলে -- বিজয়সিংহ বলে। সেটা বাপের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে, নিজের মতো আরও কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়ে জাহাজে করে ভেসে লঙ্কা নামক টাপুতে হাজির। তখন ওদেশে বুনো জাতের আবাস, যাদের বংশধরেরা এক্ষণে 'বেদ্দা' নামে বিখ্যাত। বুনো রাজা বড় খাতির করে রাখলে, মেয়ে বে দিলে। কিছুদিন ভাল মানষের মতো রইল; তারপর একদিন মাগের সঙ্গে যুক্তি করে হঠাৎ রাত্রে সদলবলে উঠে বুনো রাজাকে সরদারগণ সহিত কতল করে ফেললে। তারপর বিজয়সিংহ হলেন রাজা, দুষ্টুমির এইখানেই বড় অন্ত হলেন না। তারপর আর তাঁর বুনোর-মেয়ে রানী ভাল লাগলো না। তখন ভারতবর্ষে থেকে আরও লোকজন, আরও অনেক মেয়ে আনালেন। অনুরাধা বলে এক মেয়ে তো নিজে করলেন বিয়ে, আর সে বুনোর মেঢেকে জলাঞ্জলি দিলেন; সে জাতকে জাত নিপাত করতে লাগলেন। বেচারীরা প্রায় সব মারা গেল, কিছু অংশ ঝাড়-জক্ষগলে আজও বাস করছে। এই রকম করে লঙ্কার নাম হল সিংহল, আর হল বাঙালী বদমাশের উপনিবেশ। ক্রমে অশোক মহারাজার আমলে তাঁর ছেলে মাহিন্দো আর মেয়ে সংঘমিত্তা সন্ন্যাস নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে সিংহল টাপুতে উপস্থিত হলেন। এঁরা গিয়ে দেখলেন যে লোকগুলো বড়ই আদাড়ে হয়ে গিয়েছে। আজীবন পরিশ্রম করে সেগুলোকে যথাসম্ভব সভ্য করলেন, উত্তম উত্তম নিয়ম করলেন; আর শাক্যমুনির সম্প্রদায়ে আনলেন। দেখতে দেখতে সিলোনিরা বেজায় গোঁড়া বৌদ্ধ হয়ে উঠল। লঙ্কাদীপের মধ্যভাগে এক প্রকান্ড শহর বানালে, তার নাম দিলে অনুরাধাপুরম, এখনও সে শহরের ভগ্নাবশেষ দেখলে আক্কেল হয়রান হয়ে যায়। প্রকান্ড প্রকান্ড স্তূপ, ক্রোশ ক্রোশ পাথরের ভাঙা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আরো কত জঙ্গল হয়ে রয়েছে, এখনও সাফ হয় নাই। সিলোনময় নেড়া মাথা, করোয়াধারী, হলদে চাদড় মোড়া ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ছড়িয়ে পড়ল। জায়গায় জায়গায় বড় বড় মন্দির উঠল -- মস্ত মস্ত ধ্যানমূর্তি, জ্ঞানমুদ্রা করে প্রচারমূর্তি, কাত হয়ে শুয়ে মহানির্বাণ মূর্তি -- তার মধ্যে। আর দ্যালের গায়ে সিলোনিরা দুষ্টুমি করলে নরকে তাদের কি হাল হয়, তাই আঁকা; কোনটাকে ভূতে ঠেঙাচ্চে, কোনটাকে করাতে চিরচে, কোনটাকে পোড়াচ্চে, কোনটাকে তপ্ত তেলে ভাজচে, কোনটার ছাল ছাড়িয়ে নিচ্চে -- সে মহা বীভৎস কারখানা। এ 'অহিংসা পরমো ধর্মে'র ভেতরে যে এমন কারখানা কে জানে বাপু! চীনেও ঐ হাল, জাপানেও ঐ। এদিকে তো অহিংসা আর সাজার পরিপাটি দেখলে আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। এক 'অহিংসা পরমো ধর্মের'র বাড়িতে ঢুকেচে -- চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া করে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারান্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি; অহিংসা পরমো ধর্মঃ।' বাচ্চা-অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তবে চোরকে কি করা যায়?' কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও।' চোর জোড় হাত করে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া!'

বৌদ্ধরা বড় শান্ত, সকল ধর্মের উপর সমদৃষ্টি -- এই তো শুনেছিলুম। বৌদ্ধ প্রচারকেরা আমাদের কলকেতায় এসে রঙ-বেরঙের গাল ঝাড়ে; অথচ আমারা তাদের যথেষ্ট পূজা করে থাকি। অনুরাধাপুরে প্রচার করছি একবার, হিঁদুদের মধ্যে -- বৌদ্ধদের মধ্যে নয় -- তাও খোলা মাঠে, কারুর জমিতে নয়। ইতিমধ্যে দুনিয়ার বৌদ্ধ 'ভিক্ষু'-গৃহস্থ, মেয়ে-মদ্দ, ঢাক-ঢোল কাঁসি নিয়ে এসে সে যে বিটকেল আওয়াজ আরম্ভ করলে, তা আর কি বলব! লেকচার তো 'অলমিতি' হল; রক্তারক্তি হয় আর কি! অনেক করে হিঁদুদের বুঝিয়ে দেওয়া গেল যে, আমরা নয় একটু অহিংসা করি এস -- তখন শান্ত হয়।

ক্রমে উত্তর দিক থেকে হিঁদু তামিলকুল ধীরে ধীরে লঙ্কায় প্রবেশ করলে। বৌদ্ধরা বেগতিক দেখে রাজধানী ছেড়ে, কান্দি নামক পার্বত্য শহর স্থাপন করলে। তামিলরা কিছুদিনে তাও ছিনিয়ে নিলে এবং হিন্দুরাজা খাড়া করলে। তারপর এল ফিরিঙ্গির দল, স্পানিয়ার্ড, পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ। শেষে ইংরেজ রাজা হয়েছেন। কান্দির রাজবংশ তাঞ্জোরে প্রেরিত হয়েছেন, পেনশন আর মুড়গ্তন্নির ভাত খাচ্ছেন।

উত্তর সিলোনে হিঁদুর ভাগ অনেক অধিক; দক্ষিণ ভাগে বৌদ্ধ আর রঙ-বেরঙের দোআঁশলা ফিরিঙ্গি। বৌদ্ধদের প্রধান স্থান -- বর্তমান রাজধানী কলম্বো, আর হিন্দুদের জাফনা। জাতের গোলমাল ভারতবর্ষ হতে এখানে অনেক কম। বৌদ্ধদের একটু আছে বে-থার সময়। খাওয়া-দাওয়ার বৌদ্ধদের আদতে নেই; হিঁদুদের কিছু কিছু। যত কসাই, সব বৌদ্ধ ছিল। আজকাল কমে যাচ্ছে; ধর্ম প্রচার হচ্ছে। বৌদ্ধদের অধিকাংশ ইওরোপি নাম ইন্দ্রম-পিন্দ্রম এখন বদ্‌লে নিচ্ছে। হিঁদুদের সব রকম জাত মিলে একটা হিঁদু জাত হয়েছে; তাতে অনেকটা পাঞ্জাবী জাঠদের মতো সব জাতের মেয়ে, মায় বিবি পর্যন্ত বে করা চলে। ছেলে মন্দিরে গিয়ে ত্রিপুণ্ড্র কেটে 'শিব শিব' বলে হিঁদু হয়। স্বামী হিন্দু, স্ত্রী ক্রিশ্চান। কপালে বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বললেই ক্রিশ্চান সদ্য হিঁদু হয়ে যায়। তাতেই তোমাদের উপর এখানকার পাদ্রীরা এত চটা। তোমাদের আনাগোনা হয়ে অবধি, বহুৎ ক্রিশ্চান বিভূতি মেখে 'নমঃ পার্বতীপতয়ে' বলে হিঁদু হয়ে জাতে উঠেছে। অদ্বৈতবাদ আর বীরশৈববাদ এখানকার ধর্ম। হিঁদু-শব্দের জায়গায় 'শৈব' বলতে হয়। চৈতন্যদেব যে নৃত্যকীত্রন বঙ্গদেশে প্রচার করেন, তার জন্মভূমি দাক্ষিণাত্য, এই তামিল জাতির মধ্যে। সিলোনের তামিল ভাষা খাঁটি তামিল। সিলোনের ধর্ম, খাঁটি তামিল ধর্ম -- সে লক্ষ লোকের উন্মাদ কীর্তন, শিবের স্তবগান, সে হাজারো মৃদঙ্গের আওয়াজ আর বড় বড় কত্তালের ঝাঁজ, আর এই বিভূতি-মাখা, মোটা মোটা রুদ্রাক্ষ গলায়, পহলওয়ানি চেহারা, লাল চোখ, মহাবীরের মতো, তামিলদের মাতোয়ারা নাচ না দেখলে বুঝতে পারবে না।

কলম্বোর বন্ধুরা নাববার হুকুম আনিয়ে রেখেছিল, অতএব ডাঙায় নেবে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখাশুনা হল। স্যর কুমারস্বামী হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাঁর স্ত্রী ইংরেজ, ছেলেটি শুধু-পায়ে, কপালে বিভূতি। শ্রীযুক্ত অরুণাচলম্ প্রমুখ বন্ধু-বান্ধবেরা এলেন। অনেক দিনের পর মুড়গ্‌তন্নি খাওয়া হল, আর কিং-কোকোনাট। ঢাব কতকগুলো জাহাজে তুলে দিলে। মিসেস হিগিন্সের সঙ্গে দেখা হল, তাঁর বৌদ্ধ মেয়েদের বোর্ডিং স্কুল দেখলাম। কাউন্টেসের বাড়িটি মিসেস্ হিগিন্সের অপেক্ষা প্রশস্ত ও সাজানো। কাউন্টেস্ ঘর থেকে টাকা এনেছেন, আর মিসেস্ হিগিন্স ভিক্ষে করে করছেন। কাউন্টেস্ নিজে গেড়ুয়া কাপড় বাঙলার শাড়ীর মতো পরেন। সিলোনের বৌদ্ধদের মধ্যে ঐ ঢঙ খুব ধরে গেছে দেখলাম। গাড়ি গাড়ি মেয়ে দেখলাম, সব ঐ ঢঙের শাড়ী পরা।

বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ কান্দিতে দন্ত-মন্দির। ঐ মন্দিরে বুদ্ধ-ভগবানের একটি দাঁত আছে। সিলোনিরা বলে, ঐ দাঁত আগে পুরীতে জগন্নাথ-মন্দিরে ছিল, পরে নানা হাঙ্গামা হয়ে সিলোনে উপস্থিত হয়। সেখানেও হাঙ্গামা কম হয় নাই। এখন নিরাপদে অবস্থান করছেন! সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তমরূপে লিখে রেখেছে। আমাদের মতো নয় -- খালি আষাঢ়ে গল্প। আর বৌদ্ধদের শাস্ত্র নাকি প্রাচীন মাগধী ভাষায়, এই দেশেই সুরক্ষিত আছে। এ স্থান হতেই ব্রহ্ম শ্যাম প্রভৃতি দেশে ধর্ম গেছে। সিলোনি বৌদ্ধেরা তাদের শাস্ত্রোক্ত এক শাক্যমুনিকেই মানে, আর তাঁর উপদেশ মেনে চলতে চেষ্টা করে; নেপালি, সিকিম, ভূটানি, লাদাকি, চীনে, জাপানীদের মতো শিবের পূজা করে না; আর 'হ্রীং তারা' ওসব জানে না। তবে ভূতটুত নামানো আছে। বৌদ্ধেরা এখন উত্তর আর দক্ষিণ দু-আম্নায় হয়ে গেছে। উত্তর আম্নায়েরা নিজেদের বলে 'মহাযান'; আর দক্ষিণী অর্থাৎ সিংহলী ব্রহ্ম সায়ামি প্রভৃতিদের বলে 'হীনযান'। মহাযানওয়ালারা বুদ্ধের পূজা নামমাত্র করে; আসল পূজো তারাদেবীর, আর অবলোকিতেশ্বরের (জাপানি, চীনে ও কোরিয়ানরা বলে ক্বানয়ন); আর 'হ্রীং ক্লীং' তন্ত্র-মন্ত্রের বড় ধুম। টিবেটীগুলো আসল শিবের ভূত। ওরা সব হিঁদুর দেবতা মানে, ডমরু বাজায়, মড়ার খুলি রাখে, সাধুর হাড়ের ভেঁপু বাজায়, মদ-মাংসের যম। আর খালি মন্ত্র আওড়ে রোগ ভূত প্রেত তাড়াচ্ছে। চীন আর জাপানে সব মন্দিরের গায়ে 'ওঁ হ্রীং ক্লীং' -- সব বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা দেখেছি। সে অক্ষর বাঃলার এত কাছাকাছি যে, বেশ বোঝা যায়।

আলাসিঙ্গা কলম্বো থেকে মান্দ্রাজ ফিরে গেল। আমরাও কুমারস্বামীর (কার্তিকের নাম -- সুব্রহ্মণ্য, কুমারস্বামী ইত্যাদি; দক্ষিণ দেশে কার্তিকের ভারি পূজো, ভারি মান; কার্তিক ওঁ-কারের অবতার বলে) বাগানের নেবু,

কতকগুলো ডাবের রাজা (কিং-কোকোনাট), দু বোতল সরবৎ ইত্যাদি উপহার সহিত আবার জাহাজে উঠলাম।

মনসুন: এডেন

আটাশে জুন প্রাতঃকালে জাহাজ কলম্বো ছাড়লো। এবার ভরা মনসুনের মধ্য দিয়ে গমন। জাহাজ যত এগিয়ে যাচ্ছে, ঝড় ততই বাড়ছে, বাতাস ততই বিকট নিনাদ করছে -- উভশ্রান্ত বৃষ্টি, অন্ধকার, প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউ গর্জে গর্জে জাহাজের উপর এসে পড়ছে; ডেকের উপর তিষ্ঠুনো দায়। খাবার টেবিলের উপর আড়ে লম্বায় কাঠ দিয়ে চৌকো চৌকো খুবরি করে দিয়েছে, তার নাম 'ফিডল'। তার উপর দিয়ে খাবার দাবার লাফিয়ে উঠছে। জাহাজ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ করে উঠছে, যেন বা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কাপ্তেন বলছেন, 'তাইতো এবারকার মনসুনটা তো ভারি বিটকেল!' কাপ্তেনটি বেশ লোক; চীন ও ভারতবর্ষের নিকটবর্তী সমুদ্রে অনেকদিন কাটিয়েছেন; আমুদে লোক, আষাঢ়ে গল্প করতে ভারি মজবুত। কত রকম বোম্বেটের গল্প -- চীনে কুলি জাহাজের অফিসারদের মেরে ফেলে কেমন করে জাহাজ শুদ্ধ লুটে নিয়ে পালাতো -- এই রকম বহুৎ গল্প করছেন। আর কি করা যায়; লেখাপড়া এ দুমুনির চোটে মুশকিল। কেবিনের ভেতরে বসা দায়; জানালাটা এঁটে দিয়েছে -- ঢেউয়ের ভয়ে। একদিন তু-ভায়া একটু খুলে রেখেছিলেন, একটা ঢেউয়ের এট টুকরো এসে জলপ্লাবন করে গেল! উপরে সে ওছল-পাছলের ধুম কি! তারি ভেতরে তোমার 'উদ্বোধনে'র কাজ অল্প স্বল্প চলছে মনে রেখো। জাহাজে দুই পাদ্রী উঠেছেন। একটি আমেরিকান -- সস্ত্রীক, বড় ভাল মানুষ, নাম বোগেশ। বোগেশের সাত বৎসর বিয়ে হয়েছে; ছেলেমেয়েতে ছটি সন্তান; চাকররা বলে, খোদার বিশেষ মেহেরবানি -- ছেলেগুলোর সে অনুভব হয় না বোধ হয়। একখানা কাঁথা পেতে বোগেশ-ঘরনী ছেলেপিলেগুলিকে ডেকের উপর শুইয়ে চলে যায়। তারা নোংরা হয়ে কেঁদেকেটে গড়াগড়ি দেয়। যাত্রীরা সদাই সভয়। ডেকে বেড়াবার জো নেই; পাছে বোগেশের ছেলে মাড়িয়ে ফেলে। খুব ছোটটিকে একটি কানাতোলা চৌকা চুবড়িতে শুইয়ে, বোগেশ আর বোগেশের পাদ্রিনী জড়াজড়ি হয়ে কোণে চার ঘন্টা বসে থাকে; তোমার ইওরোপীয় সভ্যতা বোঝা দায়। আমরা যদি বাইরে কুলকুচো করি, কি দাঁত মাজি -- বলে কি অসভ্য! আর জড়ামড়িগুলো গোপনে করলে ভাল হয় না কি? তোমরা আবার এই সভ্যতার নকল করতে যাও! যাহোক প্রোটেস্টান্ট ধর্মে উত্তর ইওরোপের যে কি উপকার করেছে, তা পাদ্রী পুরুষ না দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে না। যদি এই দশ ক্রোর ইংরেজ সব মরে যায়, খালি পুরোহিত-কুল বেঁচে থাকে, বিশ বৎসরে আবার দশ ক্রোরের সৃষ্টি।

জাহাজের টাল-মাটালে অনেকেরই মাথা ধরে উঠেছে। টুটল্ বলে একটি ছোট মেয়ে বাপের সঙ্গে যাচ্ছে; তার মা নেই। আমাদের নিবেদিতা টুটলের ও বোগেশের ছেলেপিলের মা হয়ে বসেছে। টুটল্ বাপের কাছে মাইসোরে মানুষ হয়েছে। বাপ প্লান্টার। টুটল্‌কে জিজ্ঞাসা করলুম, 'টুটল্! কেমন আছ?' টুটল্ বল্‌লে, 'এ বাঙলাটা ভাল নয়, বড্ড দোলে, আর আমার অসুখ করে।' টুটলের কাছে ঘর দোর সব বাঙলা। বোগেশের একটি এঁড়ে লাগা ছেলের বড় অযত্ন; বেচারা সারাদিন ডেকের কাঠের ওপর গড়িয়ে বেড়াচ্ছে! বুড়ো কাপ্তেন মাঝে মাঝে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে চামচে করে সুরুয়া খাইয়ে যায়, আর তার পা-টি দেখিয়ে বলে, 'কি রোগা ছেলে, কি অযত্ন!'

অনেকে অনন্ত সুখ চায়। সুখ অনন্ত হলে দুঃখও যে অনন্ত হত, তার কি? তাহলে কি আর আমরা এডেন পৌঁছুতুম। ভাগ্যিস্ সুখ দুঃখ কিছুই অনন্ত নয়, তাই ছয় দিনের পথ চৌদ্দ দিন করে দিনরাত বিষম ঝড়-বাদলের মধ্য দিয়েও শেষটা এডেনে পৌঁছে গেলুম। কলোম্বো থেকে যত এগুনো যায় ততই ঝড় বাড়ে, ততই আকাশ পুকুর, ততই বৃষ্টি, ততই বাতাসের জোর, ততই ঢেউ; সে বাতাস, সে ঢেউ ঠেলে কি জাহাজ চলে? জাহাজের গতি আদ্দেক হয়ে গেল -- সকোত্রা দ্বীপের কাছাকাছি গিয়ে বেজায় বাড়লো। কাপ্তেন বললেন, 'এইখানটা মনসুনের কেন্দ্র; এইটা পেরুতে পারলেই ক্রমে ঠান্ডা সমুদ্র।' তাই হল। এ দুঃস্বপ্নও কাটলো।

৮ই সন্ধ্যাকালে এডেন। কাউকে নামতে দেবে না, কালা-গোরা মানে না। কোন জিনিস ওঠাতে দেবে না, দেখবার জিনিসও বড় নেই। কেবল ধুধু বালি, রাজপুতানার ভাব -- বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে ভেতরে কেল্লা; ওপরে পল্টনের বতারাক। সামনে অর্ধচন্দ্রাকৃত হোটেল; আর দোকানগুলি জাহাজ থেকে দেখা যাচ্চে। অনেকগুলি জাহাজ দাঁড়িয়ে। একখানি ইংরেজী যুদ্ধজাহাজ, একখানি জার্মান এল; বাকিগুলি মালের বা যাত্রীর জাহাজ। গেল বার এডেন দেখা আছে। পাহাড়ের পেছনে দিশি পল্টনের ছাউনি, বাজার। সেখান থেকে মাইল কতক গিয়ে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গহ্বর তৈয়ারি করা, তাতে বৃষ্টির জল জমে। পূর্বে ঐ জলই ছিল ভরসা। এখন যন্ত্রযোগে সমুদ্রজল বাষ্প করে আবার জমিয়ে, পরিস্কার জল হচ্ছে; তা কিন্তু মাগ্‌গি। এডেন ভারতবর্ষেই একটি শহর যেন -- দিশি ফৌজ, দিশি লোক অনেক। পারসী দোকানদার, সিন্ধি ব্যাপারী অনেক। এ এডেন বড় প্রাচীন স্থান -- রোমান বাদশা কন্‌স্টান্সিউস (Constantius) এখানে একদল পাদ্রী পাঠিয়ে ক্রিশ্চান ধর্ম প্রচার করান। পরে আরবেরা সে ক্রিশ্চানদের মেরে ফেলে। তাতে রোমি সুলতান প্রাচীন ক্রিশ্চান হাবসি দেশের বাদশাকে তাদের সাজা দিতে অনুরোধ করেন। হাবসি-রাজ ফৌজ পাঠিয়ে এডেনের আরবদের খুব সাজা দেন। পরে এডেন ইরানের সামানাটি বাদশাদের হাতে যায়। তাঁরাই নাকি প্রথমে জলের জন্য ঐ সকল গহ্বর খোদান। তারপর মুসলমান ধর্মের অভ্যুদয়ের পর এডেন আরবদের হাতে যায়। কতক কাল পরে পোর্তুগিজ সেনাপতি ঐ স্থান দখলের বৃথা উদ্যম করেন। পরে তুরস্কের সুলতান ঐ স্থানকে -- পোর্তুগিজদের ভারত মহাসাগর হতে তাড়াবার জন্য -- দরিয়াই জঙ্গের জাহাজের বন্দর করেন।

আবার উহা নিকটবর্তী আরব-মালিকদের অধিকারে যায়। পরে ইংরেজরা ক্রয় করে বর্তমান এডেন করেছেন। এখন প্রত্যেক শক্তিমান জাতির যুদ্ধপোতনিচয় পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্চে। কোথায় কি গোলযোগ হচ্চে, তাতে সকলেই দু-কথা কইতে চায়। নিজেদের প্রাধান্য, স্বার্থ, বাণিজ্য রক্ষা করতে চায়। কাজেই মাঝে মাঝে কয়লার দরকার। পরের জায়গায় কয়লা লওয়া যুদ্ধকালে চলবে না বলে, আপন আপন কয়লা নেওয়ার স্থান করতে চায়। ভাল ভালগুলি ইংরেজ তো নিয়ে বসেছেন; তারপর ফ্রান্স, তারপর যে যেথায় পায় -- কেড়ে, কিনে, খোশামোদ করে -- এক একটা জায়গা করেছে এবং করছে। সুয়েজ খাল হচ্ছে এখন ইওরোপ-আশিয়ার সংযোগ স্থান। সেটা ফরাসীদের হাতে। কাজেই ইংরেজ এডেনে খুব চেপে বসেছে, আর অন্যান্য জাতও রেড-সীর ধারে ধারে এক একটা জায়গা করেছে। কখনও বা জায়গা নিয়ে উলটো উৎপাত হয়ে বসে। সাত-শ বৎসরের পর-পদদলিত ইতালি কত কষ্টে পায়ের উপর খাড়া হল, হয়েই ভাবলে -- কি হলুম রে! এখন দিগ্বিজয় করতে হবে। ইওরোপের এক টুকরোও কারও নেবার জো নাই; সকলে মিলে তাকে মারবে! আশিয়ায় বড় বড় বাঘা-ভালক্‌কো -- ইংরেজ, রুশ, ফ্রেঞ্চ, ডচ -- এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন বাকি আছে দু-চার টুকরো আফ্রিকার। ইতালি সেই দিকে চলল। প্রথমে উত্তর আফ্রিকায় চেষ্টা করলে। সেথায় ফ্রান্সের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এল। তারপর ইঘরেজরা রেড-সীর ধারে একটা জমি দান করলে। মতলব -- সেই কেন্দ্র হতে ইতালি হাবসি-রাজ্য উদরসাৎ করেন। ইতালিও সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগুলেন। কিন্তু হাবসি বাদশা মেনেলিক্‌ এমনি গো-বেড়েন দিলে যে, এখন ইতালির আফ্রিকা ছেড়ে প্রাণবাঁচানো দায় হয়েছে। আবার রুশের ক্রিশ্চানি নাকি এক রকমের -- তাই রুশের বাদশা ভেতরে ভেতরে হাবসিদের সহায়।

রেড-সী

জাহাজ তো রেড-সীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। পাদ্রী বললেন, 'এই -- এই রেড-সী, ইহুদী নেতা মুসা সদলবলে পদব্রজে পার হয়েছিলেন। আর তাদের ধরে নিয়ে যাবার জন্যে মিসরি বাদশা 'ফেরো' যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন, তারা কাদায় রথচক্রে ডুবে -- কর্ণের মতো আটকে -- জলে ডুবে মারা গেল'। পাদ্রী আরও বললেন যে, এ-কথা

এখন আধুনিক বিজ্ঞান -- যুক্তির দ্বারা প্রমাণ হতে পারে। এখন সব দেশে ধর্মের আজগুবিগুলি বিজ্ঞানের খুক্তি দিয়ে প্রমাণ করবার এক ঢেউ উঠেছে। মিঞা! যদি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ সবগুলি হয়ে থাকে তো আর তোমার য়াভে-দেবতা মাঝখান থেকে আসেন কেন? বড়ই মুশকিল! যদি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হয় তো ও-কেরামতগুলি আজগুবি এবং তোমার ধর্ম মিথ্যা। যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলেও তোমার দেবতার মহিমাটি বাড়ার ভাগ, ও আর সব প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় আপনা-আপনি হয়েছে। পাদ্রী বোগেশ বললে, 'আমি অত শত জানিনি, আমি বিশ্বাস করি।' এ-কথা মন্দ নয় -- এ সহ্যি হয়। তবে ঐ যে একদল আছে -- পরের বেলা দোষটি দেখাতে, যুক্তিটি আনতে কেমন তৈয়ার; নিজের বেলায় বলে, 'আমি বিশ্বাস করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়' -- তাদের কথাগুলো একদম অসহ্য। আ মরি! ওঁদের আবার মন! ছটাকও নয়, আবার মণ! পরের বেলায় সব কুসংস্কার, বিশেষ যেগুলো সাহেবে বলেছে; আর নিজে একটা কিম্ভূত-কিমাকার কল্পনা করে কেঁদেই অস্থির!!

জাহাজ ক্রমেই উত্তরে চলেছে। এই রেড-সীর কিনার -- প্রাচীন সভ্যতার এক মহাকেন্দ্র। ঐ -- ওপারে আরবের মরুভূমি; এপারে -- মিসর। সেই প্রাচীন মিসর; এই মিসরিরা পন্ট্ দেশ (সম্ভবতঃ মালাবার) হতে রেড-সী পার হয়ে, কত হাজার বৎসর আগে, ক্রমে ক্রমে রাজ্য বিস্তার করে উত্তরে পৌঁছেছিল। এদের আশ্চর্য শক্তিবিস্তার, রাজ্যবিস্তার, সভ্যতাবিস্তার। যবনেরা এদের শিষ্য। এদের বাদশাদের পিরামিড নামক আশ্চর্য সমাধিমন্দির, নারীসিংহী মূর্তি। এদের মৃত দেহগুলি পর্যন্ত আজও বিদ্যমান। বাবরি-কাটা চুল; কাছাহীন ধপ্‌ধপে ধুতি পরা, কানে কুন্ডল, মিসরি লোক সব, এই দেশে বাস করত। এই -- হিকস্ বংশ, ইরানী বাদশাহি, সিকন্দর, টলেমি বংশ এবং রোমক ও আরব বীরদের রঙ্গভূমি -- মিসর। সেই ততকাল আগে এরা আপনাদের বৃত্তান্ত পাপিরস্ পত্রে, পাথরে, মাটির বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে তন্ন তন্ন করে লিখে গেছে।

এই ভূমিতে আইসিসের পূজা, হোরসের প্রাদুর্ভাব। এই প্রাচীন মিসরিদের মতে -- মানুষ মলে তার সূক্ষ্ম শরির বেড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মৃত শরীরের ধ্বংস হলেই সূক্ষ্ম শড়িরের একান্ত নাশ, তাই শরির রাখবার এত যত্ন। তাই রাজা-বাদশাদের পিরামিড। কত কৌশল! কি পরিশ্রম! সবই আহা বিফল !! ঐ পিরামিড খুঁড়ে, নানা কৌশলে রাস্তার রহস্য ভেদ করে রত্নলাভে দস্যুরা সর রাজ-শরির চুরি করেছে। আজ নয়, প্রাচীন মিসরিরা নিজেরাই করেছে। পাঁচ সাত-শ বৎসর আগে এই সকল শুকনো মরা -- ইহুদী ও আরব ডাক্তারেরা মহৌষধি-জ্ঞানে ইওরোপ-সুদ্ধ রোগীকে খাওয়াত। এখনও উহা বোধ হয় ইউনানি হাকিমির আসল 'মামিয়া'!!

এই মিশরে টলেমি বাদশার সময়ে সম্রাট ধর্মাশোক ধর্মপ্রচারক পাঠান। তারা ধর্ম প্রচার করত, রোগ ভাল করত, নিরামিষ খেত, বিবাহ করত না, সন্ন্যাসী শিষ্য করত। তারা নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলে -- থেরাপিউট, অসসিনি, মানিকি ইত্যাদি -- যা হতে বর্তমান ক্রিশ্চানি ধর্মের সমুদ্ভব। এই মিসরই টলেমিদের রাজত্বকালে সর্ববিদ্যার আকর হয়ে উঠেছিল। এই মিসরেই সে আলেকজেন্দ্রিয়া নগর, যেখানকার বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বিদ্বজ্জন জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। সে আলেকজেন্দ্রিয়া মূর্খ গোঁড়া ইতর ক্রিশ্চানদের হাতে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল -- পুস্তকালয় ভস্মরাশি হল -- বিদ্যার সর্বনাশ হল! শেষ বিদুষী নারীকে[১৮] ক্রিশ্চানেরা নিহত করে, তাঁর নগ্নদেহ রাস্তায় রাস্তায় সকল প্রকার বীভৎস অপমান করে টেনে বেড়িয়ে, অস্থি হতে টুকরা টুকরা মাংস আলাদা করে ফেলেছিল!

আর দক্ষিণে -- বীরপ্রসূ আরবের মরুভূমি। কখন আলখাল্লা-ঝোলানো -- পশমের গোছা দড়ি দিয়ে একখানা মস্ত রুমাল মাথায় আঁটা -- বদ্দু আরব দেখেছ? -- সে চলন, সে দাঁড়াবার ভঙ্গি, সে চাউনি, আর কোনও দেশে নাই। আপাদমস্তক দিয়ে মরুভূমির অনবরুদ্ধ হাওয়ার স্বাধীনতা ফুটে বেরুচ্ছে -- সেই আরব। যখন ক্রিশ্চানদের গোঁড়ামি

[১৮] হাইপেশিয়া (Hypatia)

আর গথদের বর্বতা প্রাচীন ইউনান[১৯] ও রোমান সভ্যতালোককে নির্বাণ করে দিলে, যখন ইরান অন্তরের পূতিগন্ধ ক্রমাগত সোনার পাত দিয়ে মোড়বার চেষ্টা করছিল, যখন ভারতে -- পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনীর গৌরবরবি অস্তাচলে, উপরে মূর্খ ক্রূর রাজবর্গ, ভিতরে ভীষণ অশ্লীলতা ও কামপূজার আবর্জনরাশি -- সেই সময়ে এই নগণ্য পশুপ্রায় আরবজাতি বিদ্যুদ্বেগে ভূমন্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

ঐ স্টীমার মক্কা হতে আসছে -- যাত্রী ভরা; ঐ দেখ -- ইওরোপী পোশাকপরা তুর্ক, আধা ইওরোপীবেশে মিসরি, ঐ সুরিয়াবাসী মুসলমান ইরানীবেশে, আর ঐ আসল আরব ধুতিপরা -- কাছা নেই। মহম্মদের পূর্বে কাবার মন্দিরে উলঙ্গ হয়ে প্রদক্ষিণ করতে হত; তাঁর সময় থেকে একটা ধুতি জড়াতে হয়। তাই আমাদের মুসলমানেরা নমাজের সময় ইজারের দড়ি খোলে, ধুতির কাছা খুলে দেয়। আর আরবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফ্রি, সিদি, হাবসি রক্ত প্রবেশ করে চেহারা উদ্যম -- সব বদলে গেছে, মরুভূমির আরব পুনর্মূষিক হয়েছেন। যারা উত্তরে, তারা তুরস্কের রাজ্যে বাস করে -- চুপচাপ করে। কিন্তু সুলতানের ক্রিশ্চান প্রজারা তুরস্ককে ঘৃণা করে, আরবকে ভালবাসে, 'আরবরা লেখাপড়া শেখে, ভদ্রলোক হয়, অত উৎপেতে নয়' -- তারা বলে। আর খাঁটি তুর্করা ক্রিশ্চানদের উপর বড়ই অত্যাচার করে।

মরুভূমি অত্যন্ত উত্তপ্ত হলেও সে গরম দুর্বল করে না। তাতে কাপড়ে গা-মাথা ঢেকে রাখলেই আর গোল নেই। শুষ্ক গরমি -- দুর্বল তো করেই না, বরং বিশেষ বলকারক। রাজপুতানার, আরবের, আফ্রিকার লোকগুলি এর নিদর্শন। মারোয়াড়ের এক এক জেলায় মানুষ, গরু, ঘোড়া -- সবই সবল ও আকারে বৃহৎ। আরবী মানুষ ও সিদিদের দেখলে আনন্দ হয়। যেখানে জোলা গরমি, যেমন বাঙলা দেশ, সেখানে শরীর অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আর সব দুর্বল।

রেড-সীর নামে যাত্রীদের হৃৎকম্প হয় -- ভয়ানক গরম, তায় এই গরমি কাল। ডেকে বসে যে যেমন পারছে, একটা ভীষণ দুর্ঘটনার গল্প শোনাচ্ছে। কাপ্তেন সকলের চেয়ে উঁচিয়ে বলছেন। তিনি বললেন, 'দিন কতক আগে একখানা চীনি যুদ্ধজাহাজ এই রেড-সী দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাপ্তেন ও আট জন কয়লাওয়ালা খালাসী গরমে মরে গেছে।'

বাস্তবিক কয়লাওয়ালা -- একে অগ্নিকুন্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, তায় রেড-সীর নিদারুণ গরম। কখন কখন খেপে ওপরে দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ে, আর ডুবে মরে; কখনও বা গরমে নিচেই মারা যায়।

এই সকল গল্প শুনে হৃৎকম্প হবার তো যোগাড়। কিন্তু অদৃষ্ট ভাল, আমরা বিশেষ গরম কিছুই পেলুম না। হাওয়া দক্ষিণী না হয়ে উত্তর থেকে আসতে লাগল -- সে ভূমধ্যসাগরের ঠান্ডা হাওয়া।

সুয়েজখালে: হাঙ্গর শিকার

১৪ই জুলাই রেড-সী পার হয়ে জাহাজ সুয়েজ পৌঁছল। সামনে -- সুয়েজখাল। জাহাজে -- সুয়েজে নাবাবার মাল আছে। তার উপর এসেছেন মিসরে প্লেগ, আর আমরা আনছি প্লেগ সম্ভবতঃ -- কাজেই দোতরফা ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়। এ ছুঁৎছাঁতের ন্যাটার কাছে আমাদের দিশি ছুঁৎছাঁত কোথায় লাগে! মাল নাববে, কিন্তু সুয়েজের কুলি জাহাজ ছুঁতে পারবে না। জাহাজে খালাসী বেচারাদের আপদ আর কি! তারাই কুলি হয়ে ক্রেনে করে মাল তুলে, আলটপ্‌কা

[১৯] যবন, গ্রীক

নিচে সুয়েজী নৌকায় ফেলছে -- তারা নিয়ে ডাঙায় যাচ্ছে। কোম্পানির এজেন্ট ছোট লঞ্চে করে জাহাজের কাছে এসেছেন, ওঠবার হুকুম নেই। কাপ্তেনের সঙ্গে জাহাজে নৌকায় কথা হচ্ছে। এ তো ভারতবর্ষ নয় যে, গোরা আদমী প্লেগ আইন-ফাইন সকলের পার -- এখানে ইওরোপের আরম্ভ। স্বর্গে ইঁদুর-বাহন প্লেগ পাছে ওঠে, তাই এত আঢোজন। প্লেগ-বিষ -- প্রবেশ থেকে দশ দিনের মধ্যে ফুটে বেরোন; তাই দশ দিনের আটক। আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে -- ফাঁড়া কেটে গেছে। কিন্তু মিসরি আদমীকে ছুঁলেই আবার দশ দিন আটক -- তাহলে আর নেপল্‌সেও লোক নাবানো হবে না, মার্সাইতেও নয়; কাজেই যা কিছু কাজ হচ্ছে, সব আলগোছে; কাজেই ধীরে ধীরে মাল নাবাতে সারাদিন লাগবে। রাত্রিতে জাহাজ অনায়াসেই খাল পার হতে পারে, যদি সামনে বিজলী-আলো পায়; কিন্তু সে আলো পরাতে গেলে, সুয়েজের লোককে জাহাজ ছুঁতে হবে, বস্‌ -- দশ দিন কারাঁটীন্‌ (quarantine)। কাজেই রাতেও যাওয়া হবে না, চব্বিশ ঘন্টা এইখানে পড়ে থাকো -- সুয়েজ বন্দরে।

এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর, প্রায় তিন দিকে বালির ঢিপি আর পাহাড় -- জলও খুব গভীর। জলে অসংক্য মাছ আর হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। এই বন্দরে আর অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বন্দরে যত হাঙ্গর, এমন আর দুনিয়ার কোথাও নাই -- বাগে পেলেই মানুষকে খেয়েছে। জলে নাবে কে? সাপ আর হাঙ্গরের ওপর মানুষেরও জাতক্রোধ; মানুষও বাগে পেলে ওদের ছাড়ে না।

সকাল বেলা খাবার-দাবার আগেই শোনা গেল যে, জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্চে। জল-জ্যান্ত হাঙ্গর পূর্বে আর কখন দেখা যায়নি -- গতবারে আসবার সময় সুয়েজে জাহাজ অল্পক্ষণই ছিল, তা-ও আবার শহরের গায়ে। হাঙ্গরের খবর শুনেই আমরা তাড়াতাড়ি উপস্থিত। সেকেন্ড কেলাসটি জাহাজের পাছার উপর -- সেই ছাদ হতে বারান্দা ধরে কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে ঝুঁকে হাঙ্গর দেখছে। আমরা যখন হাজির হলুম, তখন হাঙ্গর-মিঞারা একটু সরে গেছেন; মনটা বড়ই ক্ষুন্ন হল। কিন্তু দেখি যে, জলে গাক্ষ্‌ধাড়ার মতো এক প্রকার মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ভাসছে। আর এক রকম খুব ছোট মাছ জলে থিক্‌ থিক্‌ করছে। মাঝে মাঝে এক একটা বড় মাছ, অনেকটা ইলিস মাছের চেহারা, তীরের মতো এদিক ওদিক করে দৌড়ুচ্চে। মনে হল, বুঝি উনি হাঙ্গরের বাচ্চা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানলুম -- তা নয়, ওর নাম বনিটো। পূর্বে ওর বিষয় পড়া গেছলো বটে; এবং মালদ্বীপ হতে উনি শুঁটকিরূপে আমদানি হন হুড়ি চড়ে -- তাও পড়া ছিল। ওর মাংস লাল ও বড় সুসদাদু -- তাও শোনা আছে। এখন ওর তেজ আর বেগ দেখে খুশি হওয়া গেল। অত বড় মাছটা তীরের মতো জলের ভিতর ছুটছে, আর সে সমোদ্রের কাচের মতো জল, তার প্রত্যেক অঙ্গ-ভঙ্গি দেখা যাচ্চে। বিশ মিনিট, আধঘন্টা-টাক, এই প্রকার বনিটোর ছুটোছুটি আর ছোট মাছের কিলিবিলি তো দেখা যাচ্চে। আধ ঘন্টা, তিন কোয়ার্টার -- ক্রমে তিতিবিরক্ত হয়ে আসছি, এমন সময়ে একজন বললে -- ঐ ঐ! দশ বার জন বলে উঠল -- ঐ আসছে, ঐ আসছে!! চেয়ে দেখি, দূরে একটা প্রকান্ড কালো বস্তু ভেসে অসছে, পাঁচ সাত ইঞ্চি জলের নিচে। ক্রমে বস্তুটা এগিয়ে আসতে লাগলো। প্রকান্ড থ্যাবড়া মাথা দেখা দিল; সে গদাইলস্করি চাল, বনিটোর সোঁ সোঁ তাতে নেই; তবে একবার ঘাড় ফেরালেই একটা মস্ত চক্কর হল। বিভীষণ মাছ; গম্ভীর চালে চলে আসছে -- আর আগে আগে দু-একটা ছোট মাছ; আর কতকগুলো ছোট মাছ তার পিঠে গায়ে পেটে খেলে বেড়াচ্ছে। কোন কোনটা বা জেঁকে তার ঘাড়ে চড়ে বসছে। ইনি সসাঙ্গোপাঙ্গ হাঙ্গর। যে মাছগুলি হাঙ্গরের আগে আগে যাচ্ছে, তাদের নাম 'আরকাটী মাছ -- পাইলট ফিস্‌।' তারা হাঙ্গরকে শিকার দেখিয়ে দেয়, আর বোধ হয় প্রসাদটা-আসটা পায়। কিন্তু হাঙ্গরের সে মুখ-ব্যাদান দেখলে তারা যে বেশি সফল হয়, তা বোধ হয় না। যে মাছগুলি আশেপাশে ঘুরছে, পিঠে চড়ে বসছে, তারা হাঙ্গর-'চোষক'। তাদের বুকের কাছে প্রায় চার ইঞ্চি লম্বা ও দুই ইঞ্চি চওড়া চেপটা গোলপানা একটি স্থান আছে। তার মাঝে, যেমন ইংরেজী অনেক রবারের জুতোর তলায় লম্বা লম্বা জুলি-কাটা কিরকিরে থাকে, তেমনি জুলি-কাটাকাটা। সেই জায়গাটা ঐ মাছ, হাঙ্গরের গায়ে দিয়ে চিপসে ধরে; তাই হাঙ্গরের গায়ে পিঠে চড়ে চলছে দেখায়। এরা নাকি হাঙ্গরের গায়ের পোকা-মাকড় খেয়ে বাঁচে। এই দুইপ্রকার মাছ পরিবেষ্টিত না হয়ে হাঙ্গর চলেন না। আর এদের, নিজের সহায়-পরিষদ জ্ঞানে কিছু বলেনও না। এই মাছ একটা ছোট হাতসুতোয় ধরা পড়ল। তার বুকে জুতোর তলা

একটু চেপে দিয়ে পা তুলতেই সেটা পায়ের সঙ্গে চিপসে উঠতে লাগলো; ঐ রকম করে সে হাঙ্গরের গায়ে লেগে যায়।

সেকেন্ড কেলাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ। তাদের মধ্যে একজন ফৌজি লোক -- তার তো উৎসাহের সীমা নেই। কোথা থেকে জাহাজ খুঁজে একটা ভীষণ বঁড়শির যোগাড় করলে, সে 'কুয়োর ঘটি তোলার' ঠাকুরদাদা। তাতে সেরখানেক মাংস আচ্ছা দড়ি দিয়ে জোর করে জড়িয়ে বাঁধলে। তাতে এক মোটা কাছি বাঁধা হল। হাত চার বাদ দিয়ে, একখানা মস্ত কাঠ ফাতনার জন্য লাগানো হল। তারপর ফাতনা-সুদ্ধ বঁড়শি, ঝুপ করে ফেলে দেওয়া হল। জাহাজের নিচে একখান পুলিশের নৌকা -- আমারা আসা পর্যন্ত চৌকি দিচ্ছিল, পাছে ডাঙার সঙ্গে আমাদের কোন রকম ছোঁয়াছুঁয়ি হয়। সেই নৌকার উপর আবার দুজন দিব্বি ঘুমুচ্ছিল, আর যাত্রীদের যথেষ্ট ঘৃণার কারণ হচ্ছিল। এক্ষণে তারা বড় বন্ধু হয়ে উঠল। হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিঞা চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন। কি একটা হাঙ্গামা উপস্থিত বলে কোমর আঁটবার যোগাড় করছেন, এমন সময় বুঝতে পারলেন যে অত হাঁকাহাঁকি, কেবল তাঁকে -- কড়িকাষ্ঠরূপ হাঙ্গর ধরবার ফাতনাটিকে টোপ সহিত কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়ে দেবার অনুরোধ-ধ্বনি। তখন তিনি নিঃশ্বাস ছেড়ে, আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে একটা বল্লির ডগায় করে ঠেলেঠুলে ফাতনাটাকে তো দূরে ফেললেন; আর আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে, পায়ের ডগায় দাঁড়িয়ে বারান্দায় ঝুঁকে, ঐ আসে ঐ আসে -- শ্রীহাঙ্গরের জন্য 'সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানং' হয়ে রইলাম; এবং যার জন্যে মানুষ ঐ প্রকার ধড়্‌ফড়্‌ করে, সে চিরকাল যা করে, তাই হতে লাগলো -- অর্থাৎ 'সখি শ্যাম না এলো'। কিন্তু সকল দুঃখেরই একটা পার আছে। তখন সহসা জাহাজ হতে প্রায় দুশ' হাত দুরে, বৃহৎ ভিস্তির মসকের আকার কি একটা ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে, 'ঐ হাঙ্গর, ঐ হাঙ্গর' রব। 'চুপ্‌ চুপ্‌ -- ছেলের দল! হাঙ্গর পালাবে।' 'বলি, ওহে সাদা টুপিগুলো একবার নাবাও না, হাঙ্গরটা যে ভড়কর যাবে' -- ইত্যাকার আওয়াজ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে, তাবৎ সেই হাঙ্গর লবণসমুদ্রজন্মা, বঁড়শিসংলগ্ন শোরের মাংসের তালটি উদরাগ্নিতে ভস্মাবশেষ করবার জন্য, পালভরে নৌকার মতো সোঁ করে সামনে এসে পড়লেন। আর পাঁচ হাত -- এইবার হাঙ্গরের মুখ টোপে ঠেকেছে। সে ভীম পুচ্ছ একটু হেললো -- সোজা গতি চক্রাকারে পরিণত হল। যাঃ, হাঙ্গর চলে গেল হে! আবার পুচ্ছ একটু বাঁকলো, আর সেই প্রকান্ড শরীর ঘুরে, বঁড়শিমুখো দাঁড়ালো। আবার সোঁ করে আসছে -- ঐ হাঁ করে বঁড়শি ধরে ধরে! আবার সেই পাপ লেজ নড়ল, আর হাঙ্গর শরীর ঘুরিয়ে দূরে চলল। আবার ঐ চক্র দিয়ে আসছে, আবার হাঁ করছে; ঐ -- টোপটা মুখে নিয়েছে, এইবার -- ঐ ঐ চিতিয়ে পড়ল; হয়েছে, টোপ খেয়েছে -- টান্‌ টান্‌ টান্‌ ৪০।৫০ জনে টান; প্রাণপণে টান। কি জোর মাছের! কি ঝটপট -- কি হাঁ। টান্‌ টান্‌। জল থেকে এই উঠল, ঐ যে জলে ঘুরছে, আবার চিতুচ্ছে, টান্‌ টান্‌। যাঃ, টোপ খুলে গেল! হাঙ্গর পালালো। তাই তো হে, তোমাদের কে তাড়াতাড়ি বটপু! একটু সময় দিলে না টোপ খেতে! যেই চিতিয়েছে অমনি কি টানতে হয়? আর -- 'গতস্য শোচনা নাস্তি'; হাঙ্গর তো বঁড়শি ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড়। আড়কাটী মাছকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে কিনা তা খবর পাইনি, মোদ্দা -- হাঙ্গর তো চোঁচা। আবার সেটা ছিল 'বাঘা' -- বাঘের মতো কালো কালো ডোরা কাটা। যা হোক্‌ 'বাঘা' বঁড়শি-সন্নিধি পরিত্যাগ করবার জন্য, স-'আড়কাটী'-'রক্তচোষা' অন্তর্দধে।

কিন্তু নেহাত হতাশ হবার প্রয়োজন নেই -- ঐ যে পলায়মান 'বাঘার' গা ঘেঁষে আর একটা প্রকান্ড 'থ্যাবড়ামুখো' চলে আসছে! আহা হাঙ্গরদের ভাষা নেই! নইলে 'বাঘা' নিশ্চিত পেটের খবর তাকে দিয়ে সাবধান করে দিত। নিশ্চিত বলত, 'দেখ হে সাবধান, ওখানে একটা নূতন জানোয়ার এসেছে, বড় সুস্বাদু সুগন্ধ মাংস তার, কিন্তু কি শক্ত হাড়! এতকাল হাঙ্গর-গিরি করছি, কত রকম জানোয়ার -- জ্যান্ত, মরা, আধমরা -- উদরস্ত করেছি, বত রকম হাড়-গোড়, ইট-পাথর, কাঠ-কুটরো পেটে পুরেছি, কিন্তু এ হাড়ের কাছে আর সব মাখম হে -- মাখম!! এই দেখ না -- আমার দাঁতের দশা, চোয়ালের দশা কি হয়েছে' -- বলে একবার সেই আকটিদেশ-বিস্তৃত মুখ ব্যাদান করে আগন্তুক হাঙ্গরকে অবশ্যই দেখাত। সেও প্রাচীনবয়স-সুলভ অভিজ্ঞতা সহকারে -- চ্যাঙ-মাছের পিত্তি, কুঁজো-ভেটকির পিলে, ঝিনুকের ঠান্ডা সুরুয়া ইত্যাদি সমুদ্রজ মহৌষধির কোন-না-কোনটা ব্যবহারের উপদেশ

দিতই দিত। কিন্তু যখন ওসব কিছুই হল না, তখন হয় হাঙ্গরদের অত্যন্ত ভাষার অভাব, নতুবা ভাষা আছে, কিন্তু জলের মধ্যে কথা কওয়া চলে না! অতেব যতদিন না কোন প্রকার হাঙ্গুরে অক্ষর আবিষ্কার হচ্চে, ততদিন সে ভাষার ব্যবহার কেমন করে হয়? -- অথবা 'বাঘা' মানুষ-ঘেঁষা হয়ে মানুষের ধাত পেয়েছে, তাই 'থ্যাব্‌ড়া'কে আসল খবর কিছু না বলে মুচ্‌কে হেসে, 'ভাল আছ তো হে' বলে সরে গেল। -- 'আমি একাই ঠকবো?'

'আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়ে, পাছু পাছু যান গঙ্গা ...' -- শঙ্খধ্বনি তো শোনা যায় না, কিন্তু আগে চলেছেন 'পাইলট ফিস্', আর পাছু পাছু প্রকান্ড শরীর নাড়িয়ে আসছেন 'থ্যাবড়া'; তাঁর আশেপাশে নেত্য করছেন 'হাঙ্গর-চোষা' মাছ। আহা ও লোভ কি ছাড়া যায়? দশ হাত দরিয়ার উপর ঝিক্‌ ঝিক্‌ করে তলে ভাসছে, আর খোসবু কত দূর ছুটছে, তা 'থ্যাব্‌ড়াই' বলতে পারে। তার উপর সে কি দৃশ্য -সাদা, লাল, জরদা -- এক জায়গায়! আসল ইংরেজি শুয়োরের মাংস, কালো প্রকান্ড বঁড়শির চারি ধারে বাঁধা, জলের মধ্যে, রঙ-বেরঙের গোপীমন্ডলমধ্যস্থ কৃষ্ণের ন্যায় দোল খাচ্ছে!

এবার সব চুপ -- নোড়ো চোড়ো না, আর দেখ -- তাড়াতাড়ি করো না। মোদ্দা -- কাছির কাছে কাছে থেকো। ঐ, বঁড়শির কাছে কাছে ঘুরছে; টোপটা মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে! দেখুক। চুপ্‌ চুপ্‌ -- এইবার চিৎ হল -- ঐ যে আড়ে গিলছে; চুপ্‌ -- গিলতে দাও। তখন 'থ্যাব্‌ড়া' অবসরক্রমে, আড় হয়ে, টোপ উদরস্থ করে যেমন চলে যাবে, অমনি পড়ল টান! বিস্মিত 'থ্যাব্‌ড়া' মুখ ঝেড়ে, চাইলে সেটাকে ফেলে দিতে -- উলটো উৎপত্তি!! বঁড়শি গেল বিঁধে, আর ওপরে ছেলে বুড়ো, জোয়ান, দে টান -- কাছি ধরে দে ঠান! ঐ হাঙ্গরের মাথা জল ছাড়িয়ে উঠল -- টান্‌ ভাই টান্‌। ঐ যে -- প্রায় আধখানা হাঙ্গর জলের উপর! বাপ্‌ কি মুখ! ও যে সবটাই মুখ আর গলা হেঁ টান্‌ -- ঐ সবটা জল ছাড়িয়েছে। ঐ যে বঁড়শিটা বিঁধেছে -- ঠোঁট এফোঁড় ওফোঁড় -- টান। থাম্‌ থাম্‌ -- ও আরব পুলিস-মাঝি, ওর ল্যাজের দিকে একটা দড়ি বেঁধে দাও তো -- নইলে যে এত বড় জানোয়ার টেনে তোলা দায়। সাবধান হয়ে ভাই, ও-ল্যাজের ঝাপটায় ঘোড়ার ঠ্যাঙ ভেঙে যায়। আবার টান্‌ -- কি ভারি হে? ও মা, ও কি? তাই তো হে, হাঙ্গরের পেটের নিচে দিয়ে ও ঝুলছে কি? ও যে -- নাড়ি-ভুঁড়ি! নিজের ভারে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরুল যে! যাক্‌ ওটা কেটে দাও, জলে পড়ুক, বোঝা কমুক; টান্‌ ভাই টান্‌। এ যে রক্তের ফোয়ারা হে! আর কাপড়ের মায়া করলে চলবে না। টান্‌ -- এই এল। এইবার জাহাজের ওপর ফেলো; ভাই হুঁশিয়ার খুব হুঁশিয়ার, তেড়ে এক কামড়ে একটা হাত ওয়ার - আর ঐ লেজ সাবধান। এইবার, এইবার দড়ি ছাড় -- ধুপ্‌। বাবা, কি হাঙ্গর! কি ধপাৎ করেই জাহাজের উপর পড়ল! সাবধানের মার নেই -- ঐ কড়িকাঠখানা দিয়ে ওর মাথায় মারো। ওহে ফৌজিম্যান, তুমি সেপাই লোক, এ তোমারি কাজ। -- 'বটে তো'। রক্ত-মাখা গায়-কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাঠ উঠিয়ে দুম্‌ দুম্‌ দিতে লাগলো হাঙ্গরের মাথায়, আর মেয়েরা -- 'আহা কি নিষ্ঠুর! মেরো না' ইত্যাদি চিৎকার করতে লাগলো -- অথচ দেখতেও ছাড়বে না। তারপর সে বীভৎস কান্ড এইখানেই বিরাম হোক। কেমন করে সে হাঙ্গরের পেট চেরা হল, কেমন রক্তের নদী বইতে লাগলো, কেমন সে হাঙ্গর ছিন্ন-অন্ত্র ভিন্ন-দেহ ছিন্ন-হৃদয় হয়েও কতক্ষণ কাঁপতে লাগলো, নড়তে লাজলো; কেমন করে তার পেট থেকে অস্থি, চর্ম, মাংস, কাঠ-কুটরো এক রাশ বেরুলো -- সে সব কথা থাক। এই পর্যন্ত যে, সেদিন আমার খাওয়া-দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল। সব জিনিসেই সেই হাঙ্গরের গন্ধ বোধ হতে লাগলো।

এ সুয়েজ খাল খাতস্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন। ফর্ডিনেন্ড লেসেপ্স নামক এক ফরাসী স্থপতি এই খাল খনন করেন। ভূমধ্যসাগর আর লোহিতসাগরের সঘযোগ হয়ে ইওরোপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। মানব-জাতির উন্নতির বর্তমান অবস্থার জন্য যতগুলি কারণ প্রাচীনকাল থেকে কাজ করছে, তার মধ্যে বোধ হয় ভারতের বাণিজ্য সর্বপ্রধান। অনাদিকাল হতে, উর্বতায় আর বাণিজ্য-শিল্পে ভারতের মতো দেশ কি আর আছে? দুনিয়ার যত সূতি কাপড়, তুলা, পাট, নীল, লাক্ষা, চাল, হীরে, মতি ইত্যাদির ব্যবহার ১০০ বৎসর আগে পর্যন্ত ছিল, তা সমস্তই ভারতবর্ষ হতে যেত। তা ছাড়া উৎকৃষ্ট রেশমি পশমিনা কিংখাব ইত্যাদি

এদেশের মতো কোথাও হত না। আবার লবঙ্গ এলাচ মরিচ জায়ফল জয়িত্রি প্রভৃতি নানাবিধ মসলার স্থান -- ভারতবর্ষ। কাজেই অতি প্রাচীনকাল হতেই যে দেশ যখন সভ্য হত, তখন ঐ সকল জিনিসের জন্য ভারতের উপর নির্ভর। এই বাণিজ্য দুটি প্রধান ধারায় চলত; একটি ডাঙাপথে আফগানি ইরানী দেশ হয়ে, আর একটি জলপথে রেড-সী হয়ে। সিকন্দর শা ইরান-বিজয়ের পর নিয়াকুর্স নামক সেনাপতিকে জলপথে সিন্ধুনদের মুখ হয়ে সমুদ্র পার হয়ে লোহিতসমুদ্র দিয়ে রাস্তা দেখতে পাঠান। বাবিল ইরান গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ঐশ্বর্য যে কত পরিমাণে ভারতের বাণিজ্যের উপর নির্ভর করত, তা অনেকে জানে না। রোম-ধ্বংসের পর মুসলমানি বোগ্দাদ ও ইতালীয় ভিনিস্ ও জেনোয়া ভারতীয় বাণিজ্যের প্রদান পাশ্চাত্য কেন্দ্র হয়েছিল। যখন তুর্কেরা রোম সাম্রাজ্য দখল করে ইতালীয়দের ভারত-বাণিজ্যের রাস্তা বন্ধ করে দিলে, তখন জেনোয়ানিবাসী কলম্বাস (Christophoro Columbo) আটলান্টিক পার হয়ে ভারতে আসবার নূতন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন, ফল -- আমেরিকা মহাদ্বীপের আবিষ্ক্রিয়া। আমেরিকায় পৌঁছেও কলম্বাসের ভ্রম যায়নি যে, এ ভারতবর্ষ নয়। সেইজন্যেই আমেরিকার আদিম নিবাসীরা এখনও 'ইন্ডিয়ান' নামে অভিহিত। বেদে সিন্ধুনদের 'সিন্ধু' 'ইন্দু' দুই নামই পাওয়া যায়; ইরানীরা তাকে 'হিন্দু', গ্রীকরা 'ইন্ডুস' করে তুললে; তাই থেকে ইন্ডিয়া -- এন্ডিয়ান। মুসলমানি ধর্মের অভ্যুদয়ে 'হিন্দু' দাঁড়ালো -- কালা (খারাপ), যেমন এখন -- 'নেটিভ'।

এদিকে পোর্তুগিজরা ভারতের নূতন পথ -- আফ্রিকা বেড়ে আবিষ্কার করলে। ভারতের লক্ষ্মী পোর্তুগালের উপর সদয়া হলেন; পরে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ। ইংরেজের ভরে ভারতের বাণিজ্য, রাজস্ব -- সমস্তই; তাই ইংরেজ এখন সকলের উপর বড় জাত। তবে এখন আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতের জিনিসপত্র অনেক স্থলে ভারত অপেক্ষাও উত্তম উৎপন্ন হচ্ছে, তাই ভারতের আর তত কদর নাই। এ-কথা ইওরোপীয়েরা স্বীকার করতে চায় না; ভারত -- নেটিভপূর্ণ, ভারত যে তাদের ধন, সভ্যতার প্রধান সহায় ও সম্বল, সে কথা মানতে চায় না, বুঝতেও চায় না। আমরাও বোঝাতে কি ছাড়বো? ভেবে দেখ -- কথাটা কি। ঐ যারা চাষাভূষা তাঁতি-জোলা ভারতের নগণ্য মনুষ্য -- বিজাতিবিজিত স্বজাতিনিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্চে, তাদের পরিশ্রমফলও তারা পাচ্চে না! কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।

হে ভারতের শ্রমজীবি! তোমার নীরব অনবরত-নিন্দিত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বাবিল, ইরান, আলেকজেন্দ্রিয়া, গ্রীস, রোম, ভিনিস, জেনোয়া, বোগ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন, পোর্তুগাল, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও ঐশ্বর্য। আর তুমি? -- কে ভাবে এ-কথা। স্বামীজী! তোমাদের পিতৃপুরুষ দুখানা দর্শন লিখেছেন, দশখানা কাব্য বানিয়েছেন, দশটা মন্দির করেছেন -- তোমাদের ডাকের চোটে গগন ফাটছে; আর যাদের রুধিরস্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি -- তাদের গুণগান কে করে? লোকজয়ী ধর্মবীর রণবীর কাব্যবীর সকলের চোখের উপর, সকলের পূজ্য; কিন্তু কেউ যেখানে দেখে না, কেউ যেখানে একটা বাহবা দেয় না, যেখানে সকলে ঘৃণা করে, সেখানে বাস করে অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা; আমাদের গরিবরা ঘরদুয়ারে দিনরাত যে মুখ বুজে কর্তব্য করে যাচ্চে, তাতে কি বীরত্ব নাই? বড় কাজ হাতে এলে অনেকেই বীর হয়, দশ হাজার লোকের সামনে কাপুরুষও অক্লেশে প্রাণ দেয়, ঘোর স্বার্থপরও নিষ্কাম হয়; কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কার্যে সকলের অজান্তেও যিনি সেই নিঃস্বার্থতা, কর্তব্যপরায়ণতা দেখান, তিনিই ধন্য -- সে তোমরা ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি! -- তোমাদের প্রণাম করি।

এ সুয়েজ খালও অতি প্রাচীন জিনিস। প্রাচীন মিসরের ফেরো বাদশাহের সময় কতকগুলি লবণাম্বু জলা খাতের দ্বারা সংযুক্ত করে উভয়সমুদ্রস্পর্শী এক খাতে তৈয়ার হয়। মিসরে রোমরাজ্যের শাসনকালেও মধ্যে মধ্যে ঐ খাত মুক্ত রাখবার চেষ্টা হয়। পরে মুসলমান সেনাপতি অমরু মিসর বিজয় করে ঐ খাতের বালুকা উদ্ধার ও অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ বদলে এক প্রকার নূতন করে তোলেন।

তারপর বড় কেউ কিছু করেননি। তুরস্ক সুলতানের প্রতিনিধি, মিসর-খেদিব ইস্মায়েল ফরাসীদের পরামর্শে অধিকাংশ ফরাসী অর্থে এই খাত খনন করান। এ খালের মুশকিল হচ্চে যে, মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাবার দরুন পুনঃপুনঃ বালিতে ভরে যায়। এই খাতের মধ্যে বড় বাণিজ্য-জাহাজ একখানি একবারে যেতে পারে। শুনেছি যে, অতি বৃহৎ রণতরী বা বাণিজ্য-জাহাজ একেবারেই যেতে পারে না। এখন একখানি জাহাজ যাচ্চে আর একখানি আসছে, এ দুয়ের মধ্যে সংঘাত উপস্থিত হতে পারে -- এই জন্যে সমস্ত খালটি কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ভাগের দুই মুখে কতকটা স্থান এমন ভাবে প্রশস্ত করে দেওয়া আছে, যাতে দুই-তিনখানি জাহাজ একত্র থাকতে পারে। ভূমধ্যসাগেমুখে প্রধান আফিস, আর প্রত্যেক বিভাগেই রেল স্টেশনের মতো স্টেশন। সেই প্রধান আফিসে জাহাজটি খালে প্রবেশ করবামাত্রই ক্রমাগত তারে খবর যেতে থাকে। কখানি আসছে, কখানি যাচ্চে এবং প্রতি মুহূর্তে তারা কে কোথায় -- তা খবর যাচ্চে এবং একটি বড় নকশার উপর চিহ্নিত হচ্চে। একখানির সামনে যদি আর একখানি আসে, এজন্য এক স্টেশনের হুকুম না পেলে আর এক স্টেশন পর্যন্ত জাহাজ যেতে পায় না।

এই সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরেজদের, তথাপি সমস্ত কার্য ফরাসীরা করে -- এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।

ভূমধ্যসাগর

এবার ভুমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই -- এশিয়া, আফ্রিকা -- প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়া শেষ হল, আর এক প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হল -- ইওরোপ এল। শুধু তাই নয় -- নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহুশতাব্দীব্যাপী যে মহা-সংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে। যে ধর্ম, যে বিদ্যা, যে সভ্যতা, যে মহাবীর্য আজ ভূমন্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভুমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে -- ভাস্কর্যবিদ্যার আকর, বহুধনধান্যপ্রসূ অতি প্রাচীন মিসর; পূর্বে ফিনিসিয়ান, ফিলিস্টিন, ইহুদী, মহাবল বাবিল, আসির ও ইরানী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি -- এশিয়া মাইনর; উত্তরে -- সর্বাশ্চর্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।

স্বামীজী! দেশ নদী পাহাড় সমুদ্রের কথা তো অনেক শুনলে, এখন প্রাচীন কাহিনী কিছু শোন। এ প্রাচীন কাহিনী বড় অদ্ভুত। গল্প নয় -- সত্য; মানবজ্যতির যথার্থ ইতিহাস। এই সকল প্রাচীন খবন ঐতিহাসিকের অদ্ভুত গল্পপূর্ণ প্রবন্ধ অথবা বাইবেল-নামক ইহুদী পুরাণের অত্যদ্ভুত বর্ণনা মাত্র। অখন পুরানো পাথর, বাড়ি-ঘর, টালিতে লেখা পুঁথি, আর ভাষাবিশ্লেষ শত মুখে গল্প করছে। এ গল্প এখন সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনি কত আশ্চর্য কথা বেরিয়ে পড়েছে, পরে কি বেরুবে কে জানে? দেশ-দেশান্তরের মহা মহা পন্ডিত দিনরাত এক টুকরো শিলালেখ বা ভাঙা বাসন বা একটা বাড়ি বা একখান টালি নিয়ে মাথা ঘামাচ্চেন, আর সেকালের লুপ্ত বার্তা বার করছেন।

যখন মুসলমান নেতা ওসমান কনস্টান্টিনোপল দখল করলে, সমস্ত পূর্ব ইওরোপে ইসলামের ধ্বজা সগর্বে উড়তে লাগলো, তখন প্রাচীন গ্রীকদের যে সকল পুস্তক, বিদ্যাবুদ্ধি তাদের নির্বীর্য বংশধরদের কাছে লুকানো ছিল, তা পশ্চিম ইওরোপে পলায়মান গ্রীকদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রীকেরা রোমের বহুকাল পদানত হয়েও বিদ্যা-

বুদ্ধিতে রোমকদের গুরু ছিল। এমন কি, গ্রীকরা ক্রিশ্চান হওয়ায় এবং গ্রীক ভাষায় ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে ক্রিশ্চান ধর্মের বিজয় হয়। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক, জাদের আমরা যবন বলি, যারা ইওরোপী সভ্যতার আদ্‌গুরু, তাদের সভ্যতার চরম উত্থান ক্রিশ্চানদের অনেক পূর্বে। ক্রিশ্চান হয়ে পর্যন্ত তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি সমস্ত লোপ পেয়ে গেল, কিন্তু যেমন হিন্দুদের ঘরে পূর্ব-পুরুষদের বিদ্যা-বুদ্ধি কিছু কিছু রক্ষিত আছে, তেমনি ক্রাশ্চান গ্রীকদের কাছে ছিল; সেই সকল পুস্তক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাতেই ইংরেজ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রথম সভ্যতার উন্মেশ। গ্রীকভাষা, গ্রীকবিদ্যা শেখবার একটা ধুম পড়ে গেল। প্রথমে যা কিছু ঐ সকল পুস্তকে ছিল, তা হড়সুদ্ধ গেলা হল। তারপর যখন নিজেদের বুদ্ধি মার্জিত হয়ে আসতে লাগলো এবং ক্রমে ক্রমে পদার্থ-বিদ্যার অভ্যুত্থান হতে লাগলো, তখন ঐ সকল গ্রন্থের সময়, প্রণেতা, বিষয়, যাথাতথ্য ইত্যাদির গবেশণা চলতে লাগলো। ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থগুলি ছাড়া প্রাচীন অ-ক্রিশ্চান গ্রীকদের সমস্ত গ্রন্থের উপর মতামত প্রকাশ করতে তো আর কোন বাধা ছিল না, কাজেই বাহ্য এবং আভ্যন্তর সমালোচনার এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়ল।

মনে কর, একখানা পুস্তকে লিখেছে যে অমুক সময় অমুক ঘটনা ঘটেছিল। কেউ দয়া করে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেছেন বললেই কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেষ সে কালের, অনেক কথাই কল্পনা করে লিখত। আবার প্রকৃতি, এমন কি, আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল; এই সকল কারণে গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সত্যাসত্যের নির্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে লাগলো।

প্রথম উপায় -- মনে কর, একজন গ্রীক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, অমুক সময়ে ভারতবর্ষে চন্দ্রগুপ্ত বলে একজন রাজা ছিলেন। যদি ভারতবর্ষের গ্রন্থেও ঐ সময়ে ঐ রাজার উল্লেখ দেখা যায়, তাহলে বিষয়টা অনেক প্রমাণ হল বইকি। যদি চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলো টাকা পাওয়া যায় বা তাঁর সময়ের একটা বাড়ি পাওয়া যায়, যাতে তাঁর উল্লেখ আছে, তাহলে আর কোন গোলই রইল না।

দ্বিতীয় উপায় -- মনে কর, আবার একটা পুস্তকে লেখা আছে যে একটা ঘটনা সিকন্দর বাদশার সময়ের, কিন্তু তার মধ্যে দু-একজন রোমক বাদশার উল্লেখ রয়েছে, এমন ভাবে রয়েছে যে প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্ভব নয় -- তাহলে সে পুস্তকটি সিকন্দর বাদশার সময়ের নয় বলে প্রমাণ হল।

তৃতীয় উপায় ভাষা -- সময়ে সময়ে সকল ভাষারই পরিবর্তন হচ্চে, আবার এক এক লেখকের এক একটা ঢঙ থাকে। যদি একটা পুস্তকে খামকা একটা অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা লেখকের বিপরীত ঢঙে থাকে, তাহলেই সেটা প্রক্ষিপ্ত বলে সন্দেহ হবে। এই প্রকার নানা প্রকারের সন্দেহ, সংশয়, প্রমাণ প্রয়োগ করে গ্রন্থতত্ত্ব-নির্ণয়ের এক বিদ্যা বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্থ উপায় -- তার উপর আধিনিক বিজ্ঞান দ্রুতপদসঞ্চারে নানা দিক হতে রশ্মি বিকিরণ করতে লাগলো; ফল -- যে পুস্তকে কোন অলৌকিক ঘটনা লিখিত আছে, তা একেবারেই অবিশ্বাস্য হয়ে পড়ল।

সকলের উপর -- মঃআতরঙ্গরূপ সংস্কৃত ভাষার ইওরোপে প্রবেশ এবং ভারতবর্ষে, ইউফ্রেটিস নধীতটে ও মিসরদেশে প্রাচীন শিলালেখের পুনঃপঢন; আর বহুকাল ভূগর্ভে বা পর্বতপার্শ্বে লুক্কায়িত মন্দিরাদির আবেষ্ক্রিয়া ও তাহাদের যথার্থ ইতিহাসের জ্ঞান। পূর্বে বলেছি যে, এ নূতন গবেষণা-বিদ্যা 'বাইবেল' বা 'নিউ টেস্টামেন্ট' গ্রন্থগুলিকে আলাদা রেখেছিল। এখন মারধোর, জ্যান্ত পোড়ানো তো আর নেই, কেবল সমাজের ভয়; তা উপেক্ষা করে অনেকগুলি পন্ডিত উক্ত পুস্তকগুলিকেও বেজায় বিশ্লেষ করেছেন। আশা করি, হিন্দু প্রভৃতির ধর্মপুস্তককে ওঁরা যেমন বেপরোয়া হয়ে টুকরো টুকরো করেন, কালে সেই প্রকার সৎ-সাহসের সহিত ইহুদী ও ক্রিশ্চান পুস্তকাদিকেও করবেন। একথা বলি কেন, তার একটা উদাহরণ দিই -- মাসপেরো (Maspero) বলে এক মহাপন্ডিত, মিসর

প্রত্নতত্ত্বের অতিপ্রতিষ্ঠ লেখক, 'ইস্তোয়ার আঁসিএন ওরিআঁতাল'[২০] বলে মিসর ও বাবিলদিগের এক প্রকান্ড ইতিহাস লিখেছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের এক ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ব বিদের ইংরেজীতে তর্জমা পড়ি। আবার ব্রিটিশ মিউজিয়ামের (British Museum) এক অধ্যক্ষকে কয়রকখানি মিসর ও বাবিল-সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করায় মাসপেরোর গ্রন্থের কথা উল্লখ হয়। তাতে আমার কাছে উক্ত গ্রন্থের তর্জমা আছে শুনে তিনি বললেন যে ওতে হবে না, অনুবাদক কিছু গোঁড়া ক্রিশ্চান; এজন্য যেখানে যেখানে মাসপেরোর অনুসন্ধান খ্রীষ্টধর্মকে আঘাত করে, সব গোলমাল করে দেওয়া আছে! মূল ফরাসী ভাষায় গ্রন্থ পড়তে বললেন। পড়ে দেখি তাইতো -- র যে বিষম সমস্যা। ধর্মগোঁড়ামিটুকু কেমন জিনিস জান তো? -- সত্যাসত্য সব তাল পাকিয়ে যায়। সেই আবধি ও-সব গবেষণাগ্রন্থের তর্জমার ওপর অনেকটা শ্রদ্ধা কমে গেছে।

আর এক নূতন বিদ্যা জন্মেছে, যার নাম জাতিবিদ্যা (ethnology), অর্থাৎ মানুষের রঙ, চুল, চেহারা, মাথার গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে শ্রেণীবদ্ধ করা।

জার্মানরা সর্ববিদ্যায় বিশারদ হলেও সংস্কৃত আর প্রাচীন আসিরীয় বিত্যায় বিশেষ পটু; বর্নফ (Burnouf) প্রভৃতি জার্মান পন্ডিত ইহার নিদর্শন। ফরাসীরা প্রাচীন মিসরের তত্ত্ব উদ্ধারে বিশেষ সফল -- মাসপেরো-প্রমুখ পন্ডিতমন্ডলী ফরাসী। ওলন্দাজেরা ইহুদী ও প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের বিশ্লেষণে বিশেষপ্রতিষ্ঠ -- কুনা (Kuenen) প্রভৃতি লেখক জগৎপ্রসিদ্ধ। ইংরেজরা অনেক বিদ্যা আরম্ভ করে দিয়ে তারপর সরে পড়ে।

এই সকল পন্ডিতদের মত কিছু বলি। যদি ভাল না লাগে, তাদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কর, আমায় দোষ দিও না।

হিঁদু, ইহুদী, প্রাচীন বাবিলি, মিসরি প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের মতে, সমস্ত মানুষ এক আদিম পিতামাতা হতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ-কথা এখন লোকে বড় মানতে চায় না।

কালো কুচকুচে, নাকহীন, ঠোঁটপুরু, গড়ানে কপাল, আর কোঁকড়াচুল কাফ্রি দেখেছ? প্রায় ঐ ঢঙের গড়ন, তবে আকারে ছোট, চুল অত কোঁকড়া নয়, সাঁওতালি আন্ডামানি ভিল দেখেছ? প্রথম শ্রেণীর নাম নিগ্রো (Negro)। এদের বাসভূমি আফ্রিকা। দ্বিতীয় জাতির নাম নেগ্রিটো (Negrito) -- ছোট নিগ্রো; এরা প্রাচীনকালে আরবের কতক অংশে, ইওফ্রেটিস্ তটের অংশে, পারস্যের দক্ষিণভাগে, ভারতবর্ষময়, আন্ডামান প্রভৃতি দ্বীপে, মায় অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বাস করত। আধুনিক সময়ে ভারতের কোন কোন ঝোড়-জঙ্গলে, আন্ডামানে এবং অস্ট্রেলিয়ায় এরা বর্তমান।

লেপচা, ভূটিয়া, চীনি প্রভৃতি দেখেছ? -- সাদা রঙ বা হলদে, সোজা কালো চুল? কালো চোখ, কিন্তু চোখ কোনাকুনি বসান, দাঁড়ি গোঁফ অল্প, চেপটা মুখ, চোখের নিচের হাড় দুটো ভারি উঁচু।

নেপালি, বর্মি, সায়ামি, মালাই, জাপানি দেখেছ? এরা ঐ গড়ন, তবে আকারে ছোট।

এ শ্রেণীর দুই জাতির নাম মোগল (Mongols) আর মোগলইড্ (ছোট মোগল)। 'মোগল' জাতি এক্ষণে অধিকাংশ আশিয়াখন্ড দখল করে বসেছে। এরাই মোগল, কালমুখ (Kalmucks), হুন, চীন, তাতার, তুর্ক, মানচু,

[২০] Histoire Anciene Oriental

কিরগিজ প্রভৃতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হয়ে এক চীন ও তিব্বতি সওয়ায়[২১] তাঁবু নিয়ে আজ এদেশ, কাল ওদেশ করে ভেড়া ছাগল গরু ঘোড়া চড়িয়ে বেড়ায়, আর বাগে পেলেই পঙ্গপালের মতো এসে দুনিয়া ওলট-পালট করে দেয়। এদেশের আর একটি নাম তুরানি। ইরান তুরান -- সেই তুরান!

রঙ কালো, কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোখ -- প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়ায় বাস করত এবং অধুনা ভারতময় -- বিশেষ দক্ষিণদেশে বাস করে; ইওরোপেও এক-আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায় -- এ এক জাতি। এদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি।

সাদা রঙ, সোজা চোখ, কিন্তু কান নাক -- রামছাগলের মুখের মতো বাঁকা আর ডগা মোটা, কপাল গড়ানে, ঠোঁট পুরু -- যেমন উত্তর আরবের লোক, বর্তমান ইহুদী, প্রাচীন বাবলি, আসিরি, ফিনিক প্রভৃতি। এদের ভাষাও এক প্রকারের; এদের নাম সেমিটিক। আর যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল, এদের নাম আরিয়ান।

বর্তমান জাতিই এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ওদের মধ্যে যে জাতির ভাগ অধিক যে দেশে, সে দেশের ভাষা ও আকৃতি অধিকাংশই সেই জাতির ন্যায়,

উষ্ণদেশ হলেই যে রঙ কালো হয় এবং শীতল দেশ হলেই যে বর্ণ সাদা হয়, এ-কথা এখনকার অনেকেই মানেন না। কালো এবং সাদার মধ্যে যে বর্ণগুলি, সেগুলি অনেকের মতে, জাতি-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়েছে।

মিশর ও প্রাচীন বাবিলের সভ্যতা পন্ডিতদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ সকল দেশে খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর বা ততোধিক সময়ের বাড়ি-ঘর-দোর পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জোর চন্দ্রগুপ্তের সময়ের যদি কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে -- খ্রীঃ পূঃ ৩০০ বৎসর মাত্র। তার পূর্বের বাড়ি-ঘর এখনও পাওয়া যায় নাই।[২২] তবে তার বহু পূর্বের পুস্তকাদি আছে, যা অন্য কোনও দেশে পাওয়া যায় না। পন্ডিত বালগ্গোধর তিলক প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুদের 'বেদ' অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর আগে বর্তমান আকারে ছিল।

ইওরোপী সভ্যতা

এই ভুমধ্যসাগর-প্রান্ত -- যে ইওরোপী সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী, তার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক, ইহুদী প্রভৃতি সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরানী, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্যজাতির সংমিশ্রণে বর্তমান ইওরোপী সভ্যতা।

'রোজেট্টা স্টোন'[২৩] নামক একখন্ড বৃহৎ শিলালেখ মিসরে পাওয়া যায়। তার উপর জীবজন্তুর লাঙ্গুল ইত্যাদি রূপ চিত্রলিপিতে[২৪] লিখিত এক লেখ আছে, তার নিচে আর এক প্রকার লেখ, সকলের নিম্নে গ্রীক ভাষার অনুযায়ী

---

[২১] সওয়ায় -- (আরবী শব্দ) ব্যতীত, ছাড়া।

[22] হরপ্পা এবং মহেঞ্জোডারো গ্রামে ভূগর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৩০০ বৎসর পূর্বেকার সভ্যতার নিদর্শনসকল পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইহাকে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা বলিয়াছেন।

[২৩] Rosetta Stone

[২৪] Hieroglyphics

লেখ। একজন পন্ডিত ঐ তিন লেখ-কে এক অনুমান করেন। কপ্ত (Copts) নামক যে ক্রিশ্চান জাতি এখনও মিসরে বর্তমান এবং যারা মিসরিদের বংশধর বলে বিদিত, তাদের লেখের সাহায্যে তিনি এই প্রাচীন মিসরি লিপির উদ্ধার করেন। ঐরূপ বাবিলদের ইট এবং টালিতে খোদিত ভল্লাগ্রের ন্যায় লিপিও ক্রমে উদ্ধার হয়। এদিকে ভারতবর্ষের লাঙ্গলাকৃতি কতকগুলি লেখ মহারাজা অশোকের সমসাময়িক লিপি বলে আবিষ্কৃত হয়। এতদপেক্ষা প্রাচীন লিপি ভারতবর্ষে পাওয়া যায় নাই। মিসরময় নানা প্রকার মন্দির, স্তম্ভ, শবাধার ইত্যাদিতে যে সকল চিত্রলিপি লিখিত ছিল, ক্রমে সেগুলি পঠিত হয়ে প্রাচীন মিসরতত্ত্ব বিশদ করে ফেলেছে।

মিসরিরা সমুদ্রপার 'পুনট্' (Punt) নামক দক্ষিণ দেশ হতে মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ কেউ বলেন যে, ঐ 'পুনট্'-ই বর্তমান মালাবার, এবং মিসরিরা ও দ্রাবিড়িরা এক জাতি। এদের প্রথম রাজার নাম 'মেনুস' (Menes)। এদের প্রাচীন ধর্মও কোন কোন অংশে আমাদের পৌরাণিক কথার ন্যায়। 'শিবু' (Shibu) দেবতা 'নুই' (Nui) দেবীর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়েছিলেন, পরে আর এক দেবতা 'শু' (Shu) এসে বলপূর্বক 'নুই'-কে তুলে ফেললেন। 'নুই'র শরীর আকাশ হল, দু হাত আর দু পা হল সেই আকাশের চার স্তম্ভ। আর 'শিবু' হলেন পৃথিবী। 'নুই'র পুত্র-কন্যা 'অসিরিস' আর 'ইসিস' -- মিসরের প্রধান দেব-দেবী এবং তাঁদের পুত্র 'হোরস্' সর্বোপাস্য। এই তিনজন একসঙ্গে উপাসিত হতেন। 'ইসিস' আবার গো-মাতা রূপে পূজিত।

পৃথিবীতে 'নীল' নদের ন্যায়, আকাশে ঐ প্রকার নীলনদ আছেন -- পৃথিবীর নীলনদ তাঁহার অংশ মাত্র। সূর্যদেব এদের মতে নৌকায় করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন; মধ্যে মধ্যে 'অহি' নামক সর্প তাঁকে গ্রাস করে, তখন গ্রহণ হয়।

চন্দ্রদেবকে এক শূকর মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করে এবং খন্ড খন্ড করে ফেলে, পরে পনের দিন তাঁর সারতে লাগে। মিসরের দেবতাসকল কেউ শৃগালমুখ কেউ বাজের মুখযুক্ত, কেউ গোমুখ ইত্যাদি।

সঙ্গে সঙ্গেই ইউফ্রেটিস-তীরে আর এক সভ্যতার উত্থান হয়েছিল, তাদের মধ্যে 'বাল', 'মোলখ', 'ইস্তারত' ও 'দমুজি'[২৫] প্রধান। ইস্তারত দমুজি-নামক মেষপালকের প্রণয়ে আবদ্ধ হলেন। এক বরাহ দমুজিকে মেরে ফেললে। পৃথিবীর নিচে পরলোকে ইস্তারত দমুজির অন্বেষণে গেলেন। সেথায় 'আলাৎ' নামক ভয়ঙ্করী দেবী তাঁকে বহু যন্ত্রণা দিলে। শেষে ইস্তারত বললেন যে, আমি দমুজিকে না পেলে মর্ত্যলোকে আর যাব না। তখন দেবতারা সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রতি বৎসর দমুজি চার মাস থাকবেন পরলোকে -- পাতালে, আট মাস থাকবেন মর্ত্যলোকে! তখন ইস্তারত ফিরে এলেন -- বসন্তের আগমন হল, শস্যাদি জন্মাল।

এই 'দমুজি' আবার 'আদুনোই' বা 'আদুনিস'[২৬] নামে বিখ্যাত। সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম কিঞ্চিৎ অবান্তরভেদে প্রায় এক রকমই ছিল। বাবিলি, ইহুদী, ফিনিক ও পরবর্তী আরবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। পরায় সকল দেবতারই নাম 'মোলখ' (যে শব্দটি বাঙলা ভাষাতে মালিক, মুল্লুক ইত্যাদি রুপে এখনও রয়েছে) অথবা 'বাল', তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারু কারু মত -- এ 'আলাৎ' দেবতা পরে আরবদিগের আল্লা হলেন। এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল। মোলখ বা বালের নিকট পুত্রকন্যাকে জীবন্ত পোড়ানো হত। ইস্তারতের মন্দিরে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কামসেবা প্রধান অঙ্গ ছিল।

ইহুদী জাতির ইতিহাস বাবিল অপেক্ষা অনেক আধুনিক। পন্ডিতদের মতে 'বাইবেল' নামক ধর্মগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ

---

[২৫] Baal, Moloch, Istarte, Damuzi

[২৬] Adunoi or Adonis

৫০০ হতে আরম্ভ হয়ে খ্রীঃ পর পর্যন্ত লিখিত হয়। বাইবেলের অনেক অংশ যা পূর্বের বলে প্রথিত, তা অনেক পরের। এই বাইবেলের মধ্যে স্থূল কথাগুলি 'বাবিল' জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেক স্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদশারা যখন এশিয়া মাইনরের উপর রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক 'পারসী' মত ইহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব -- আত্মা বা পরলোক নাই। নবীন ভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের।

ইহুদীদের ধর্মের প্রধান আঙ্গ 'য়াভে' নামক 'মোলখের'[২৭] পূজা। এই নামটি কিন্তু ইহুদী ভাষায় নয়, কারু কারু মতে ঐটি মিসরি শব্দ। কিন্তু কোথা থেকে এল, কেউ জানে না। বাইবেলে বর্ণনা আছে যে, এহুদীরা মিসরে আবদ্ধ হয়ে অনেকদিন ছিল -- সে সব এখন কেউ বড় মানে না এবং 'ইব্রাহিম', 'ইসহাক', 'ইয়ুসুফ' প্রভৃতি গোত্রপিতাদের রূপক বলে প্রমাণ করে।

ইহুদীরা 'য়াভে' এ নাম উচ্চারণ করত না, তার স্থানে 'আদুনোই' বলত। যখন ইহুদীরা ইস্রেল আর ইফ্রেম[২৮] দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটি প্রধান মন্দির নির্মিত হল। জেরুসালেমে ইস্রেলদের যে মন্দির নির্মিত হল, তাতে 'য়াভে' দেবতার একটি নরনারী সংযোগমূর্তি এক সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটি বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে 'য়াভে' দেবতা -- সোনামোড়া বৃষের মূর্তিতে পূজিত হতেন।

উভয় স্থানেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেবতার নিকট জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হত এবং একদল স্ত্রীলোক ঐ দুই মন্দিরে বাস করত; তারা মন্দিরের মধ্যেই বেশ্যাবৃত্তি করে যা উপার্যন করত, তা মন্দিরের ব্যয়ে লাগত।

ক্রমে ইহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হল, তাঁরা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী বা Prophet (ভাববাদী)। এদের মধ্যে অনেকে ইরানীদের সংসর্গে মূর্তিপূজা, পুত্রবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়ল। ক্রমে বলির জায়গায় হল 'সুন্নত'; বেশ্যাবৃত্তি, মূর্তি আদি ক্রমে উঠে গেল; ক্রমে ঐ নবী-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে ক্রিশ্চান ধর্মের সৃষ্টি হল।

'ঈশা' নামক কোন পুরুষ কখনও জন্মেছিলেন কিনা, এ নিয়ে বিষম বিতন্ডা। 'নিউ টেস্টামেন্টের' যে চার পুস্তক, তার মধ্যে 'সেন্ট-জন' নামক পুস্তক তো একেবারে অগ্রাহ্য হয়েছে। বাকি তিনখানি -- কোন এক প্রাচীন পুস্তক দেখে লেখা, এই সিদ্ধান্ত; তাও 'ঈশা'-হজরতের যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তার অনেক পরে।

তার উপর যে সময় ঈশা জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি, সে সময় ঐ ইহুদীদের মধ্যে দুইজন ঐতিহাসিক জন্মেছিলেন -- 'জোসিফুস্' আর 'ফিলো'[২৯]। এঁরা ইহুদীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের নামও নাই; অথবা রোমান জজ তাঁকে ক্রুশে মারতে হুকুম দিয়েছিল, এর কোন কথাই নাই। জোসিফুসের পুস্তকে এক ছত্র ছিল, তা এখন প্রক্ষিপ্ত বলে প্রমাণ হয়েছে।

রোমকরা ঐ সময়ে ইহুদীদের উপর রাজত্ব করত, গ্রীকরা সকল বিদ্যা শেখাত। এঁরা সকলেই ইহুদীদের সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখেছেন, কিন্তু ঈশা বা ক্রিশ্চানদের কোন কথাই নাই।

---

[২৭] Yave-Moloch
[২৮] Israel, Ephraim
[২৯] Josephus, Philo

আবার মুশকিল যে, যে সকল কথা, উপদেশ বা মত নিউ টেস্টামেন্ট গ্রন্থে প্রচার আছে, ও-সমস্তই নানা দিগ্‌দেশ হতে এসে খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহুদীদের মধ্যে বর্তমান ছিল এবং 'হিলেল্' (Hillel) প্রভৃতি রাব্বিগণ (উপদেশক) প্রচার করেছিলেন। পন্ডিতরা তো এইসব বলছেন, তবে অন্যের ধর্ম সম্বন্ধে -- যেমন সাঁ করে এক-কথা বলে ফেলেন, নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে তা বললে কি আর জাঁক থাকে? কাজেই শনৈঃ শনৈঃ যাচ্ছেন। এর নাম 'হায়ার ক্রিটিসিজম্' (Higher Criticism)।

পাশ্চাত্য বুধমন্ডলী এই প্রকার দেশ-দেশান্তরের ধর্ম, নীতি, জাতি ইত্যাদির আলোচনা করছেন। আমাদের বাঙলা ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি করে? -- এক বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড়ভাঙা পরিশ্রম করে যদি এই রকম একখানা বই তর্জমা করে তো সে নিজেই বা খায় কি, আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে?

একে দেশ অতি দরিদ্র, তাতে বিদ্যা একেবারে নেই বললেই হয়। এমন দিন কি হবে যে, আমরা নানাপ্রকার বিদ্যার চর্চা করব? 'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, যৎ কৃপা...'! -- মা জগদম্বাই জানেন।

জাহাজ নেপল্‌সে লাগল -- আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী টোম! এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী -- যার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ-সংস্থাপন, পরদেশ-বিজয় এখনও সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ!

নেপল্‌স ত্যাগ করে জাহাজ মার্সাইতে লেগেছিল, তারপর একেবারে লন্ডন।

ইওরোপ সম্বন্ধে তোমাদের তো নানা কথা শোনা আছে -- তারা কি খায়, কি পরে, কি রীতিনীতি আচার ইত্যাদি -- তা আর আমি কি বলবো! তবে ইওরোপী সভ্যতা কি, এর উৎপত্তি কোথায়, আমাদের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ, এ সভ্যতার কতটুকু আমাদের লওয়া উচিত -- এসব সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার রইল। শরীর কাউকে ছাড়ে না ভায়া, অতএব বারান্তরে সেসব কথা বলতে চেষ্টা করবো। অথবা বলে কি হবে? বকাবকি বলা-কওয়াতে আমাদের (বিশেষ বাঙালীর) মতো কে বা মজবুত? যদি পার তো করে দেখাও। কাজ কথা কউক, মুখকে বিরাম দাও। তবে একটা কথা বলে রাখি, গরিব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইওরোপ উঠতে লাগলো। রাশি রাশি অন্য দেশের আবর্জনার ন্যায় পরিত্যক্ত দুঃখী গরিব আমেরিকায় স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদন্ড! বড়মানুষ, পন্ডিত, ধনী -- এরা শুনলে বা না শুনলে, বুঝলে বা না বুঝলে, তোমাদের গাল দিলে বা প্রশংসা করলে কিছুই এসে যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের বাহার। কোটি কোটি গরিব নীচ যারা, তারাই হচ্চে প্রাণ। সংখ্যায় আসে যায় না, ধন বা দারিদ্র্যে আসে যায় না; কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবী উল্টে দিতে পারে -- এই বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত হবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়? যে জিনিস যত নূতন হবে, যত উত্তম হবে, সে জিনিস প্রথম তত অধিক বাধা পাবে। বাধাই তো সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ। বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই। অলমিতি।